নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ১৪

আগস্ট ২০০৪

ব্র্যাক
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৪

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী
ঢাকা ১২১২

প্রচ্ছদ : সাজেদুর রহমান

অক্ষর বিন্যাস
ও অঙ্গসজ্জা : মো. আকরাম হোসেন

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৮৭-৮৮ (পুরাতন) ৪১ (নতুন) ব্লক-সি
টঙ্গী শিল্প এলাকা
গাজীপুর ১৭১০

২০০২-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ১১টি এবং ২০০৩-এর ১টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এবং ৩টি বিশেষ প্রবন্ধ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষক বা লেখকগণের একান্ত নিজস্ব।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : হাসান শরীফ আহমেদ
সদস্য : সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম,
কানিজ ফাতেমা ও মু. গোলাম সাত্তার

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 2002 & 2003, Number 14, August 2004. Published by BRAC, Research and Evaluation Division, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

২০০৪ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং বন্যাপরবর্তী আমাদের করণীয় ৪

কেন গবেষণা? ৮

পিআরএসপি: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল ১০

দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০

আর্থ-সামাজিক

ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচি: টেকসই জীবিকার এক নতুন দিগন্ত ২৪

ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের অর্জিত প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপ ২৯

বাংলাদেশে সাক্ষরতা: প্রয়োজন নতুন ভাবনার ৩৩

ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ৩৭

মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ৪৬

আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা ৫০

আর্সেনিক প্রতিরোধে গ্রামীণ জনগণের কথা ৫৪

গ্রাম বাংলায় অপঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা কাদের বেশি? ৫৯

স্বাস্থ্য বিষয়ক

শ্বাসকষ্টের রোগ সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যসেবিকার ভূমিকা ৬১

বাংলাদেশে ৯০-র দশকে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণ এবং পুষ্টি অবস্থার পরিবর্তনশীল চিত্র - একটি তথ্যনির্ভর পর্যালোচনা ৬৪

উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার ক্ষেত্রে জনগণের আচরণগত পরিবর্তন: মতলবের অভিজ্ঞতা ৭০

কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবার উপযোগিতা ৭৪

 © ব্র্যাক

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্য নিরসন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল শীর্ষক একটি অন্তর্বর্তী কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছেন। এটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি নামেও সমধিক পরিচিতি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর পরামর্শে সরকার এই অন্তর্বর্তী দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বা A national strategy for economic growth, poverty reduction and social development বা I-PRSP তৈরি করেছে। দেশের দারিদ্র্যের বর্তমান চিত্র, দারিদ্র্য নিরসনের বিদ্যমান কৌশল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশল প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছে সরকার এই পিআরএসপি'র মাধ্যমে। দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে আরও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই অন্তর্বর্তী দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করা হবে।

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়নে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রাথমিক স্তরে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও, সুশীল সমাজ, মহিলা প্রতিনিধি এবং চতুর্থ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মতামত গৃহীত হয়। এছাড়া দাতাদের সঙ্গেও পৃথক আরেকটি বৈঠক করা হয়। এসব পরামর্শ সভার ব্যবস্থাপনায় ছিল ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বিভাগ। এক্ষেত্রে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে এই কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র বা ফোকাল পয়েন্ট করা হয়েছে।

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এটি বার্ষিক বাজেট প্রণয়নসহ উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনার মধ্যে সঙ্গতি বিধানে যেমন সহায়তা করবে, তেমনি পরিকল্পনা এবং

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে অবদান রাখবে। ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকেও দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসরত জনগণের সংখ্যা ১৯৯০-এর তুলনায় ৫০ শতাংশ হ্রাস করতে হবে। আর তা করতে হলে বাংলাদেশকে বার্ষিক ৭% হারে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। আর এটি যদি pro-poor বা গরিব অনুকূল করা সম্ভব হয় তাহলে এ প্রবৃদ্ধি থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে এবং দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। কোন ধরনের কর্মপরিকল্পনা বা কৌশলপত্রের সঠিক বাস্তবায়ন তখনই সম্ভবপর হবে যখন সরকারি ব্যবস্থাপনাসহ সকল সেক্টরে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তার উপর আরোপিত হয়েছে অনেক দায়িত্ব। এই বিভাগ ব্র্যাকের নতুন উন্নয়ন কৌশল রচনায় গবেষণাভিত্তিক সহায়তা দিয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্র্যাক 'টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করেছিল। আজ ব্র্যাক কাজ করছে অতি দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নে। এ লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে সিএফপিআর-টিইউপি কর্মসূচি।

ব্র্যাকের সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীগণ যাতে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারেন সেজন্য নির্যাসের প্রয়াস রয়েছে। এ খণ্ডে ২০০২ সালের গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ১২টি এবং ২০০৩ সালের ১টি রিপোর্টের বাংলা সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনা করা হল। আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদনে এসেছে আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি এবং আর্সেনিক প্রতিরোধে গ্রামীণ জনগণের কথা নিয়ে আরও একটি প্রতিবেদন। কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে গবেষণা কেন করা হয় তাই সে সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন "অভিমত" শিরোনামে এই সংখ্যায় ছাপা হলো। গ্রাম বাংলায় অপঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা কাদের বেশি, ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মহাখালী ফ্লাইওভার তৈরির ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচি এবং উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের অর্জিত প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপ এবং বাংলাদেশে সাক্ষরতা সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলোও এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে মতলবের অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার ক্ষেত্রে জনগণের আচরণগত পরিবর্তন, কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবার উপর একটি প্রতিবেদন, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবিকার ভূমিকা, এবং ৯০' র দশকে গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষের খাদ্যগ্রহণ ও পুষ্টিমানের চালচিত্রের উপর দুইটি প্রতিবেদন।

সাম্প্রতিক সময়ে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হচ্ছে পিআরএসপি (Poverty Reduction Strategy Paper) বা দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র। আমরা মনে করি ব্র্যাকের মাঠকর্মীদেরও এই বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত দরকার। তাই চলতি সংখ্যায় পিআরএসপি' র অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বা আই-পিআরএসপি-এর উপরও রয়েছে একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। আশা করি নির্যাসের বর্তমান খণ্ডটি আপনাদের ভাল লাগবে।

© ব্র্যাক

বিশেষ সম্পাদকীয়

২০০৪ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং বন্যাপরবর্তী আমাদের করণীয়

দেশ এক ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলা করছে। এই বিশেষ সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত (১২/০৮/০৪) বন্যায় ৩৯টি জেলার ২৬৫টি উপজেলার ৩১ হাজার ১৫৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ৪০ ভাগ এলাকা বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। বন্যার কারণে ৭০ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬৫টি পরিবারের ৩ কোটি ৪২ লাখ ৬৫ হাজার ৩৩০ জন মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৫ লাখ ৬ হাজার ৮৯৩ একর জমির ফসল পুরোপুরি এবং ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৯৮৫ একর জমির ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি সূত্রমতে শুধুমাত্র ফসল নয়, কৃষকের জমি, সবজি ক্ষেত, চিংড়ির ঘের, পানের বরজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যুসহ এই ক্ষতির পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫৩টি ঘর সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে এবং ৩১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৭২টি ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১৩ হাজার ৫৯৯ কিলোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণ এবং ৪৩ হাজার ৫০৫ কিলোমিটার রাস্তা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ হাজার ১৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ২৩ হাজার ১৮৭টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩ হাজার ৫৭ কিলোমিটার, ৫ হাজার ৩৭৮টি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি হিসাব মতে, এবারের বন্যায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা (প্রথম আলো, ১২/০৮/০৪)।

সরকার বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য প্রায় ৪ হাজার ৮৩০টি আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছে, যেগুলোতে ৯ লাখ ৮৮ হাজার ৭৯ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। জুলাই থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ৭১৮ জন। আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু ও নারী। বন্যাদুর্গত এলাকায় ডায়রিয়া প্রতিরোধে সরকারিভাবে সর্বশেষ ৩ হাজার ২৮০টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছিল এবং ৭৫০টি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে বন্যাদুর্গত এলাকায় বিভিন্ন রোগে

আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় (সাপ্তাহিক রোববার, ০৮-০৮-০৪, ৩১ তম সংখ্যা)।

সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্যা কবলিত দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজ নিজ সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকে তারা মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বসে নেই দেশের বৃহত্তম জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাক। ইতোমধ্যে ব্র্যাকের বন্যাত্রাণ বাজেট ২৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ব্র্যাকের পাঁচ হাজার সার্বক্ষণিক ও ১৫ হাজার খণ্ডকালীন কর্মী বন্যা ত্রাণতৎপরতায় অংশ নিয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার ১৮টি জেলায় কাজ করছে ব্র্যাকের ৩৬টি মেডিক্যাল টিম। বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, চর্মরোগ, টাইফয়েড, জণ্ডিস ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুখে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ব্র্যাক জরুরী ভিত্তিতে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে চিকিৎসা সেবা দিতে শহর ও গ্রাম এলাকায় অস্থায়ীভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বন্যাদুর্গতদের মাঝে চিড়া, রুটি, গুড় ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। ব্র্যাক বন্যাদুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি কনটেইনারে করে বিতরণ করেছে। ব্র্যাক ১১ আগস্ট, ২০০৪ পর্যন্ত ৮০টি এলাকায় ১১৫টি শাখার মাধ্যমে চাল ও ডাল বিতরণ করেছে। ব্র্যাকের আঞ্চলিক ও এলাকা অফিসে বানানো ৭৩ লাখ ৯০ হাজার ৫৪ পিস রুটিও বিতরণ করা হয়েছে। ব্র্যাক প্রায় ৬ লাখ ৬৫ হাজার ৮১৭ প্যাকেট খাবার স্যালাইনও বিতরণ করেছে।

বন্যায় ব্র্যাকের ২৫৮টি আঞ্চলিক ও ৪০১টি শাখা অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্র্যাকের পুষ্টিকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ হাজার ৪৯৪টি। ব্র্যাক পরিচালিত ৯ হাজার ৯৮৭টি স্কুলের ২৯ লাখ ৯৩ হাজার শিক্ষার্থীও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার সময় এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

প্রলয়ংকরী বন্যার পরে পানি এখন আস্তে আস্তে নামতে শুরু করেছে। বিভিন্ন খানার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে এখন আমাদের বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে নামতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের ৪০টি জেলার ২৩৯টি উপজেলায় প্রায় ৭ লাখ হেক্টর বা সাড়ে ১৭ লাখ একর জমির আউশ ও রোপা আমন, রোপা ধানের বীজতলা, বোনা আমন ধান, পাট ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলও বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। ফলে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে ১২ লাখ একর

জমির প্রায় ১৪ লাখ ২২ হাজার ১৩ টন ধান, পাট, শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল। টাকার অঙ্কে এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ৫ লাখ একর জমিতে বপন করা হয়েছিল বীজতলা এর মধ্যে প্রায় ২০ কোটি টাকা মূল্যের বীজতলা নষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা কি তা নির্ণয় করে চাহিদাভিত্তিক সহায়তা দিতে হবে। সহজ কিস্তির ঋণ সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

এবারের বন্যায় গবাদিপশুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষকের কাছে গবাদিপশু তার প্রাণস্বরূপ। চলতি বন্যায় বেশিরভাগ গরু প্রায় একমাস ধরে হাঁটু পানির মধ্যে ছিল। যে কারণে পানিবাহিত নানা রোগে কয়েক হাজার গরু মারা গেছে। তাই কৃষক যাতে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে গরু কিনতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে যেসব গবাদিপশু বেঁচে আছে বন্যার পানি নেমে যাবার পর তাদের যত্ন নিতে হবে। তার থাকার জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় গবাদিপশুকে টিকা দিতে হবে। গবাদিপশুর খাদ্যের ব্যাপারেও আমাদের যত্নবান হতে হবে। কাঁচা ঘাস, খড় এবং প্রক্রিয়াজাত পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

বন্যার পানি নেমে যাবার সাথে সাথেই কৃষকরা তাদের জমিতে আবার চাষাবাদ করতে নেমেছে। চাহিদাভিত্তিক সহায়তার ক্ষেত্রে তাই কৃষিখাতকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক তার নিজ চেষ্টায় বীজ সংগ্রহ করছে। সরকারি বা বেসরকারি সহযোগিতার আশায় তারা বসে নেই। এখন প্রয়োজন শুধু কৃষকদের মধ্যে তাদের চাহিদাভিত্তিক সহায়তা যেমন, সার ও বীজ পৌঁছে দেয়া। এছাড়া কৃষি ও সেচ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নলকূপগুলো মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা সহ প্রয়োজনে নতুন নলকূপ বসানোর কাজ হাতে নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বীজতলা যাতে কৃষক আবার বপন করতে পারে সেজন্য কৃষককে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বন্যাপরবর্তী বছরগুলোতে ফসল উৎপাদন বেড়ে যায়। তাই এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাস্তব এবং সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও গরিব মানুষ এখন বাধ্য হচ্ছে গ্রামের দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে। পরবর্তী সময়ে এটাই তাদের জন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। এসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, তাঁতি ও মৎসজীবীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে সহজশর্তে চাহিদাভিত্তিক ঋণ সুবিধা দিতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের এখনই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে এসব পেশাজীবীদের কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়বে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর।

 © ব্র্যাক

<u>অভিমত</u>

কেন গবেষণা ?

সৈয়দ মাসুদ আহমদ

- গবেষণা হচ্ছে কোন প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য কিংবা সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
- গবেষণার মাধ্যমে আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি, পুরানো সমস্যাটিকে নতুন জ্ঞানের আলোকে যাচাই করি।
- নীতিনির্ধারকদের সামনে তথ্য ও তত্ত্বের বিশাল পাহাড় সরিয়ে গবেষণার ফলাফল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে দেয়, ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির প্রভাব কমিয়ে দেয়।

কেন গবেষণা তা বলার আগে আমাদের জানা দরকার গবেষণা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি। গবেষণা হচ্ছে কোন একটি প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য কিংবা সমস্যার সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

অনুমানের ভিত্তিতে নয়, কিংবা নিজের মনমত নয়, নিরলস পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে গবেষণা বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে। গবেষণার মাধ্যমে আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি, পুরানো সমস্যাটিকে নতুন জ্ঞানের আলোকে যাচাই করি, সমস্যাটির বিভিন্ন দিক অনুধাবন করি এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবকে পরিবর্তনের চেষ্টা করি। এটা এমন একটি হাতিয়ার যা প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আমাদেরকে পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে দিক নির্দেশনা দেয়, আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার রসদ যোগায়।

ভৌত বা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান ছাড়াও আমরা হরহামেশাই সমাজে বিদ্যমান নানা জটিলতার সম্মুখীন হই। বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে সমাজ আলোড়িত হয়। রঙ্গমঞ্চে কুশীলবদের পরিবর্তন হয়। শক্তির নতুন নতুন বিন্যাস ঘটে। পুরান সমস্যাগুলোকে পিছনে ফেলে দিয়ে নতুন নতুন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘটনার পিছনের কারণগুলো অনুসন্ধানের জন্য দরকার গবেষণার। একমাত্র বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাই আমাদেরকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে অতীতের আলোকে বর্তমানকে মূল্যায়ন করতে এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়নে সাহায্য করে। দারিদ্র্যপীড়িত দেশে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অগ্রাধিকার নির্ধারণ। বিদ্যমান সম্পদের নিরিখে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও প্রয়োজন যাচাই করে এই কাজে সাহায্য করে গবেষণালব্ধ তথ্য। নীতিনির্ধারকদের সামনে তথ্য ও তত্ত্বের বিশাল পাহাড় সরিয়ে গবেষণার ফলাফল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে দেয়, ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির প্রভাব কমিয়ে দেয়।

তাই বলতে হয়, গবেষণা সমাজ ও প্রকৃতিকে বোঝার জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য, সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কষ্টিপাথরের এক অনুপম হাতিয়ার!

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের রয়েছে নানা সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যা ছাড়াও রয়েছে দরিদ্র শিশুদেরকে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে নেয়ার সমস্যা, স্বাস্থ্যসেবা দেয়া ও নেয়ার সমস্যা, খাদ্য নিরাপত্তার সমস্যা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব সমাধানের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্পদের নিরিখে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। এজন্য দরকার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ আর এর ভিত্তিতে সমাধানের সম্ভাবনা খুঁজে বের করা। আর এখানেই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণে গবেষণা রাখতে পারে মূল্যবান অবদান।

পিআরএসপি: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল*

- বাংলাদেশে দারিদ্র্যতার হার দ্রুত কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল (আই-পিআরএসপি)" শীর্ষক দলিল প্রণয়ন করেছে। এটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) হিসাবেও পরিচিত।
- উচ্চ মাত্রায় ঋণগ্রস্ত গরিব দেশগুলোর ঋণ মওকুফ এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর ঋণ পাবার ক্ষেত্রে পিআরএসপি সহায়তা করবে।
- দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবেও কাজ করবে। অন্যদিকে তা পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানেও অবদান রাখবে।

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper-PRSP) কী?

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper-PRSP) হচ্ছে দারিদ্র্য কমানোর বা নিরসনের জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর প্রস্তাবিত একটি কর্মসূচি। উচ্চ মাত্রায় ঋণগ্রস্ত গরিব দেশগুলোর ঋণ মওকুফ এবং বিশ্বব্যাংক

*তথ্যসূত্র: ১। বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল (অন্তর্বর্তী দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র), জানুয়ারি ২০০৪।
২। Bangladesh: A national strategy for economic growth, poverty reduction and social development' শীর্ষক বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন।
৩। পিআরএসপি, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)
৪। সাপ্তাহিক ২০০০, পিআরএসপি, বিশেষ ক্রোড়পত্র।
প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন আলতামাস পাশা।

ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ-এর ঋণ দান কর্মসূচির ভিত্তি হচ্ছে এই পিআরএসপি। বাংলাদেশও এসব দেশের মধ্যে পড়ে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ব্যাপকভাবে ঋণগ্রস্ত গরিব দেশগুলোর জন্য ঋণ মওকুফ সুবিধা ও সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যাপারটি নির্ভর করবে এসব দেশের জাতীয়ভিত্তিক নিজস্ব দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের উপর। তাই তারা একটি উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে তৈরি করে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বোর্ডে পেশ করার কথা বলে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর বোর্ড কোন দেশের পিআরএসপিকে অনুমোদন করলেই শুধু কোন দেশ বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ থেকে ঋণ পেতে পারে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতে পিআরএসপি বা দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি হবে দারিদ্র কমানোর জন্য সম্পূর্ণই একটি দেশ পরিচালিত, ফলপ্রসু, সমন্বিত, বিবেচনাযোগ্য, অংশীদারিত্বমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি বিষয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ অবশ্য এটা স্বীকার করে যে, বহু দেশের পক্ষেই একটি পরিপূর্ণ পিআরএসপি বা দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র দ্রুততার সঙ্গে তৈরি করা সম্ভবপর হবে না। সে কারণে ঋণ মওকুফ ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দ্রুততর করতে একটি অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (আই-পিআরএসপি) তৈরির পরামর্শ দেয়া হয়। উক্ত আই-পিআরএসপিতে দেশের দারিদ্র্যের বর্তমান চাল-চিত্র, দারিদ্র্য নিরসনের বিদ্যমান কৌশল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। পিআরএসপি-র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- এটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে তৈরি হবে।
- এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব একটি দেশের নিজস্ব।
- দারিদ্র্য মোকাবিলার জন্য এটি একটি নীতি এবং এজেন্ডা প্রণয়ন করবে।

বাংলাদেশও এই নির্দেশনা মোতাবেক একটি অন্তর্বতীকালীন দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বা আই-পিআরএসপির খসড়া তৈরি করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বে ১০টি দেশ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি এবং ৪২টি দেশ আই-পিআরএসপি প্রণয়ন করেছে।

স্বাধীনতার পর বিগত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে পল্লী এলাকা ও নগরের ক্রমবর্ধমান আয় ও ভোগ বৈষম্য উন্নয়নের পথে একটি বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য পরিহার করা যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক জাতীয় কৌশল নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা একান্ত ভাবে অনুভূত হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার "একটি অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল" প্রণয়ন করেছে। এর নাম দেয়া হয়েছে অন্তর্বর্তী দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বা আই-পিআরএসপি (Interim Poverty Reduction Strategy Paper-IPRSP)। দাতা সংস্থা, এনজিও ও সুশীল সমাজের মতামতের আলোকে চূড়ান্ত করা হবে কৌশলপত্রটি। তখন এটি পরিচিত হবে পিআরএসপি নামে।

করণীয় ৩টি বিষয়

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি ৩টি করণীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে; প্রথমত, অতীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য ধরে রাখাকে প্রাধান্য দেয়া এবং তা সুসংহত করা (যেমন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তি বৃদ্ধি, প্রতিষেধক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি)। দ্বিতীয়ত, অতীতে নেয়া ও গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার (যেমন, ভৌত অবকাঠামোগত অসুবিধা, সুশাসনের দুর্বলতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়)। এবং তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা (যেমন, গার্মেন্টস শিল্প থেকে কোটা পদ্ধতি উঠে যাওয়ার প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া)।

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণের বিভিন্ন পর্যায়

বাংলাদেশে আই-পিআরএসপি প্রণয়নের বিষয়টি দেখভাল করতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিবকে প্রধান করে প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়গুলো থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ১১ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠিত হয়। আই-পিআরএসপি'র বিষয়গুলো তৈরির জন্য সরকার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ২ জন ঊর্ধ্বতন

গবেষককে কনসালটেন্ট নিয়োগ করে। প্রথম পর্যায়ে দেশব্যাপী মোট ২২টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এসব পরামর্শ সভার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে ব্র্যাক। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট - এই ৫টি বিভাগীয় সদরে এ পরামর্শ সভাগুলোর আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ের এরূপ ১২টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়।

কৌশলপত্রটি প্রণয়নের লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক মত বিনিময় ও আলাপ-আলোচনা করা হয়। নিবিড় মিথষ্ক্রিয়া এবং সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সও গঠন করা হয়। আলোচনার প্রাথমিক স্তরে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, দ্বিতীয় পর্যায়ে উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়, গণমাধ্যম, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও, সুশীল সমাজ, মহিলা প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং চতুর্থ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত সংগৃহীত হয়। এ ধরনের ৩৩টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাপ্ত মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এপ্রিল ২০০২-এ কৌশলপত্রটির একটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, খসড়া কৌশলপত্রটি মাননীয় সাংসদদের কাছে পাঠিয়ে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে প্রণীত খসড়ার উপর ব্যাপক আলোচনা হয়। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে জানুয়ারি ২০০৩-এ কৌশলপত্রটির একটি সংশোধিত খসড়া প্রণীত হয়। পরবর্তীতে আইএমএফ-এর সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নেয়া কাঠামো সংশোধন করে মার্চ ২০০৩-এ খসড়াটি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ চূড়ান্ত করে।

বাজেট তৈরির ভিত্তি

এ কৌশলপত্রটি ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাঠামো গঠন করবে যা বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। এ কৌশলপত্রটি একদিকে যেমন উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনার মধ্যে সংগতি বিধানে সহায়তা করবে, অন্যদিকে তা পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধানে অবদান রাখবে।

দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক লক্ষ্যসমূহ

বাংলাদেশ থেকে ক্ষুধা এবং দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য দূর করতে ও সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে বিস্তৃত করতে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের কথা আই-পিআরএসপি-তে বলা হয়েছে:

১. ক্ষুধা, দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং চরম মাত্রার দুস্থ অবস্থা দূরীভূত করে দারিদ্র্য দূর করা।

২. দারিদ্র্য সীমার নিচে বসাবাসরত জনগণের সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস করা।

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের সকল ছেলে-মেয়ের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

৪. প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত করা।

৫. নবজাতক শিশু ও অনুর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়স্ক শিশু মৃত্যুহার ৬৫ শতাংশ হ্রাস করা এবং শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা।

৬. মাতৃমৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ হ্রাস করা।

৭. পাঁচ বছরের নীচের অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস করা এবং অপুষ্টির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা।

৮. সকলের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৯. সম্পূর্ণভাবে না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে গরিব এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উপর সামাজিক সন্ত্রাস দূরীভূত করা; বিশেষত নারী ও শিশুর প্রতি সন্ত্রাস বন্ধ করা।

১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় এ বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করা।

২০১৫ সালের মধ্যে আয়-দারিদ্র্য মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে যদি পল্লী এলাকায় মাথা পিছু ভোগ ব্যয় বছরে কমপক্ষে ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া আগামী ১৫ বছর ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার গড়ে ৭ শতাংশ অর্জন করার কথা কৌশলপত্রে বলা হয়েছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য নিরসন

কৌশলপত্রে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ৫টি প্রধান কৌশলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের উপর। এগুলো হচ্ছে:

১. দরিদ্রদের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়ে তাদের জন্য অনুকূল হয় এমন প্রবৃদ্ধি অর্জন;
২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিকভাবে দরিদ্রদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন;
৩. উন্নয়নে নারীর অগ্রাধিকার ও লিঙ্গবৈষম্য নিরসন;
৪. যে কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত আয়-ব্যয়জনিত বা উপার্জনের সমস্যা এবং প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে গরিবদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং
৫. দরিদ্রদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে শাসন ব্যবস্থায় তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

সকল পথই গুরুত্বপূর্ণ

দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্রে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ তিনটি কৌশলগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রথমত, নব্বইর দশকে অর্জিত সাফল্যসমূহ সুসংহত করা। দ্বিতীয়ত, বিগত দশকের নেতিবাচক প্রবণতাসমূহ মোকাবিলা করা, তৃতীয়ত, বৈশ্বিক (Global) অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করা। তাই দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের আওতায় বর্ণিত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ এমনভাবে গ্রহণ করা হবে যাতে তা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং যেসব অঞ্চল বিরূপ প্রতিবেশগত প্রক্রিয়ার শিকার, সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক আদিবাসী অধ্যুষিত তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং দেশের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্ব

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতিসমূহ সমন্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে অর্ন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি মজুরির কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান উভয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্র সারণের লক্ষ্যে কাজ করবে। এ জন্য প্র য়োজন হবে ১) সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সহায়ক বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্র দান, ২) সঠিক বিনিয়োগে ও বাণিজ্যিক নীতি এবং খাত ও উপখাতভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্প্র সারণের মাধ্যমে খাত-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সমস্যাগুলো দূরীকরণ, ৩.) ঝুঁকিগ্র স্ত দরিদ্রের জন্য বিশেষ ধরনের এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি জোরদার করা এবং ৪.) চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি র পদক্ষেপ বাস্তবায়ন।

দরিদ্র-সপক্ষ অর্থনৈতিক প্র বৃদ্ধি দ্রুতকরণ

অগ্র াধিকার ভিত্তিতে চারটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব প্র দানের মাধ্যমে নারীসহ সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত অংশের উপর বিশেষ নজর দিয়ে প্র বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং প্র বৃদ্ধি প্র ক্রিয়ায় দরিদ্র-স্বপক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করা:

যে সব ক্ষেত্রে প্র াধান্য দেয়া হবে

- দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে প্র াধান্য দেবে। বিশেষত কৃষিভিত্তিক, তথ্য ও যোগাযোগ প্র যুক্তিভিত্তিক শিল্প এবং রফতানি বাণিজ্য এক্ষেত্রে প্র াধান্য পাবে।
- শিক্ষাখাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্র যুক্তি একটি প্র ধান ভূমিকা পালন করবে। প্র াথমিক, কারিগরি এবং ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনা হবে।
- স্বাস্থ্যখাতেও উন্নয়ন কৌশলকে পুনর্নির্ধারণ করা হবে। নতুন করে প্র াধান্য পাবে শহরভিত্তিক প্র াথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, প্র ধান প্র ধান স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন ডেঙ্গু ও আর্সেনিক। দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্র দানের পরিধি বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া প্র জনন স্বাস্থ্যসেবার পরিধিও বাড়ানো হবে।

- দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নের সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করতে বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এবং সামাজিক সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়ন সহজ করতে একটি মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাসঙ্গিক সামষ্টিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা অনুসরণ এবং প্রধান প্রধান মধ্যবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা।

এ কাঠামো জাতীয় আয় হিসাব, লেনদেন ভারসাম্য এবং আর্থিক ও রাজস্ব হিসাবকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে একত্রিত করেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট কাঠামোও এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এ কাঠামোর প্রধান লক্ষ্য হল জিডিপি প্রবৃদ্ধির ত্বরান্বিত হার অর্জন এবং তা ২০০৪ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশ হতে ২০০৬ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রয়াস চালানো।

পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। এ উদ্দেশ্যে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ এবং কারিগরি সামর্থ্য গড়ে তোলা হবে। আই-পিআরএসপিতে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে একটি সর্বাত্মক দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হবে। এটি নীতি নির্ধারকদেরকে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কৌশলের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মন্ত্রী ও সচিব এবং বেসরকারিখাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কাউন্সিল (National Poverty Reduction Council বা NPRC) গঠন করা হবে। এ কাউন্সিলের মূল উদ্দেশ্য হবে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা

ভাবনা করা এবং তা মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত কৌশল ও নীতি সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণও কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হবে। ফোকাল পয়েন্ট NPRC এর সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে। এ কাউন্সিল তিনমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে।

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ শুধু সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দারিদ্র্য প্রবণতা এবং দারিদ্র্য নিরসন নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে স্বাধীন মূল্যায়নের জন্য ফিলিপাইনের Social Weather Station এর মত সুশীল সমাজের পদক্ষেপকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলের পথ নকশা

দারিদ্র্য নিরসন নীতির বর্তমান অন্তর্বর্তী কৌশলকে রূপান্তরিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশল তৈরির ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিবেচনায় আনা হবে;

ক) চলমান উন্নয়ন এবং উদ্ভূত অগ্রাধিকারকে মোকাবিলা করার সক্ষমতাসহ তাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সংশিষ্ট সকল গোষ্ঠীর সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন ও কার্যকরী আন্তঃক্রিয়া ও আলোচনা অব্যাহত রাখা; সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের একত্রিত করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা;

খ) কৌশল বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মসূচি ও সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন; এবং

গ) অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ও সময়মত ফিডব্যাক পাবার জন্য একটি কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি স্থাপন।

পূর্ণাঙ্গ কৌশল প্রণয়নকালে বিশদ লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়াস নেয়া হবে যেন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন এবং এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যয় নির্ধারণ ও অর্থায়ন সহজতর হয়। এই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পরিবীক্ষণ নির্দেশকসমূহ ও এসবের উৎস, এবং নিয়মিত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হবে যাতে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর হয়। একই সময়ে লক্ষ্য অর্জনের

অগ্র   গতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য সুশীল সমাজের উদ্যোগসমূহের উন্নতি সাধন করা হবে। পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণ করা হবে ডিসেম্বর, ২০০৪।

তবে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপর। আর এ তিনটিই দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের বাস্তবায়নে পূর্বশর্ত। কারণ জবাবদিহিতা, সুশাসন ও কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকলে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ Millenium Development Goal বা (MDG) অর্জনের বিষয়টি পূর্বের মতোই এড়িয়ে যাওয়া হবে। আর তাই সরকারের পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দরকার ব্যাপকভিত্তিক প্র   াতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের। এসব কার্যাবলী আরও সুসংহত করতে উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত প্র তিষ্ঠান বা সংস্থাগুলোর আরও গণতন্ত্রায়ন প্র   য়োজন। দরকার গরিব মানুষের ক্ষমতায়নকে বেগবান করা।

দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত ‘সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক’ অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে দেশে দেশে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ, নিরক্ষরতা, পরিবেশের অবক্ষয় এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে অংশীদারীত্ব বাড়ানোর জন্য বিশ্বের নেতারা সময়ানুগ ও পরিমাপযোগ্য কতিপয় লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেন। এইসব সম্মিলিত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা আজ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য নামে পরিচিতি অর্জন করেছে এবং জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশে তা গৃহীত হয়েছে। শীর্ষ বৈঠকের শেষে ‘সহস্রাব্দ ঘোষণায়’ সে সকল লক্ষ্য অর্জনে করণীয় বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৫ সালের ভেতর চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে হ্রাস এবং এইচআইভি/এইডস এর প্রসার রোধ এসকল লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত। এই সহস্রাব্দ ঘোষণায়, মানবাধিকার, সুশাসন ও গণতান্ত্রয়ন, বিরোধ প্রতিরোধ এবং শান্তি স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয় মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে। মন্টেরে শীর্ষ বৈঠকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন’। এই সম্মেলনে ধনী দেশগুলো অঙ্গীকার করে যে, যেসব উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশ প্রয়োজনীয় কিন্তু কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করবে, তারা সেসব দরিদ্র দেশের উপর থেকে বাণিজ্য বাধা দূর করবে, অধিকতর সাহায্য দেবে এবং তাদের ঋণভার অর্থপূর্ণভাবে লাঘব করবে। এই বিশ্বব্যাপী ধারণা ২০০২ সালে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ বৈঠকে পুনরায় ব্যক্ত হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রাকে ঘিরে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এসেছেন এবং একটি অভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার সরকারি নেতারা এসকল লক্ষ্যে

রাজনৈতিক বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করেছেন। অন্যদিকে, অর্থমন্ত্রীরা এ লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার সাহায্যে উন্নয়নের ধারায় অগ্রাধিকার কি হবে তা ঠিক করতে চাইছেন। কিছু কিছু এলাকায়, যেমন আফ্রিকায় অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নে মিলেনিয়াম লক্ষ্যকে সমন্বিত করার চেষ্টা চলছে। নিম্নে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হলোঃ

লক্ষ্য ১ : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা

লক্ষ্য মাত্রা ১। যাদের আয় দিনপ্রতি ১ ডলারের কম, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের আনুপাতিক অংশ অর্ধেক হ্রাস

লক্ষ্য মাত্রা ২। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীতে ক্ষুধার্ত মানুষের আনুপাতিক অংশ অর্ধেক হ্রাস

লক্ষ্য ২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা

লক্ষ্য মাত্রা ৩। ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশু যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পূর্ণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা

লক্ষ্য ৩ : নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

লক্ষ্য মাত্রা ৪। ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা

লক্ষ্য ৪ : শিশু মৃত্যু হ্রাস

লক্ষ্য মাত্রা ৫। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস

লক্ষ্য ৫ : প্র   সূতি-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন

লক্ষ্য মাত্রা ৬। ১৯৯০ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে প্র   সবকালীন মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস

লক্ষ্য ৬ : এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের মোকাবিলা

লক্ষ্য মাত্রা ৭। ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস এর বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস

লক্ষ্য মাত্রা ৮। ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস

লক্ষ্য ৭ : টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা

লক্ষ্য মাত্রা ৯। জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অঙ্গীভুত করা এবং পরিবেশীয় সম্পদের ক্ষয়রোধ

লক্ষ্য মাত্রা ১০। নিয়মিত সুপেয় পানি পায় না এমন জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেক হ্রাস

লক্ষ্য মাত্রা ১১। ২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমান লক্ষ্যণীয়ভাবে উন্নত করা

লক্ষ্য ৮ : উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারীত্ব গড়ে তোলা

লক্ষ্য মাত্রা ১২। একটি মুক্ত, নিয়ম-ভিত্তিক, নিশ্চিত ও বৈষম্যহীন বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা: এখানে সুসাশন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকল্প যুক্ত হবে

লক্ষ্য মাত্রা ১৩। স্বল্পোন্নত দেশের (এল ডি সি) বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। এর মধ্যে থাকবে: শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানীর সুযোগ; গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত দেশের জন্য ঋণমুক্তি কার্যক্রম জোরদার করা এবং দ্বি পাক্ষিক ঋণ অবলোপন করা; দারিদ্র্য দূরীকরণে সংকল্পবদ্ধ দেশকে অধিক পরিমাণে ও ডি এ প্রদান

লক্ষ্য মাত্রা ১৪। উপকূল-হীন দেশ এবং উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

লক্ষ্য মাত্রা ১৫। উন্নয়নশীল দেশের ঋণ দায়ভার যেন দীর্ঘকাল সহনীয় পর্যায়ে থাকে, সেজন্য দেশজ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নেয়া

লক্ষ্য মাত্রা ১৬। উন্নয়নশীল দেশের সহযোগিতায় তরুণদের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

লক্ষ্য মাত্রা ১৭। ঔষধ শিল্পের সহযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশে ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে অতি-প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি

লক্ষ্য মাত্রা ১৮। ব্যক্তি-মালিকানা খাতের সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগসহ অন্যান্য খাতে নতুন প্রযুক্তির সুবিধা বৃদ্ধি

সূত্রঃ UNDP. Millennium Development Goals.
http://www.undp.org/mdg/

© ব্র্যাক

ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচি: টেকসই জীবিকার এক নতুন দিগন্ত*

মিক্ হাওস, শামীম আরা, চিরঞ্জীব সাহা, আলেয়া বেগম এবং মো. আসাদুলাহ

- গ্রামীণ পরিবারের ৭০ শতাংশের বেশি মোরগ-মুরগি পালনের সঙ্গে যুক্ত।
- দেশী মোরগ-মুরগিকে যে খাবার দেয়া হয় তার গুণাগুণ খুব একটা ভাল না এবং খাবার দেয়ার ক্ষেত্রেও কোন ধারাবাহিকতা থাকে না।
- গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা তাদের খামারের উপর নিজেদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।
- ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচি নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ব্যাপক সাফল্য বয়ে এনেছে।
- মোরগ-মুরগি পালন কর্মসূচি পুষ্টির যোগানও দিচ্ছে।
- ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচিভুক্ত এলাকাগুলোতে জীবন ও জীবিকার মানের যথেষ্ট ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

ব্র্যাকের মোরগ-মুরগি পালন বা পোল্ট্রি কর্মসূচির উপর এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়। টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়ি ও পাকুটিয়া গ্রামগুলো ঐ গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ছিল।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দেশী মোরগ-মুরগি পালন কর্মসূচির বিভিন্ন দিক

বাংলাদেশে ১৩৮ মিলিয়ন মোরগ-মুরগি রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সামগ্রিকভাবে মোরগ-মুরগি প্রতিপালন খাত জিডিপিতে বিরাট অবদান রাখছে। গ্রামীণ পরিবারের ৭০ শতাংশ এর বেশি পরিবার পোল্ট্রি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দেশী

*'The BRAC Poultry Programme' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

মুরগিগুলো ৬-৭ মাস বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে এবং প্রায় ৬ বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। অবশ্য বাস্তব অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। খুব কম সংখ্যক দেশী মুরগিই এত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকে। খাবারে আমিষজনিত পুষ্টি পাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ডিম এবং মুরগির মাংস। কিন্তু আবারও বলতে হয় যে, বাস্তবে মোরগ-মুরগি লালন-পালনকারীদের মধ্যে পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ খুবই কম এবং উৎপাদিত ডিম বা মুরগির বেশিরভাগই বিক্রি হয়ে যায়।

সবক্ষেত্রে না হলেও বেশিরভাগ সময় মোরগ-মুরগি প্রতিপালন গ্রামের মেয়েদের একমাত্র আয়-উপার্জনের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিজেদের অন্যান্য গৃহস্থালির কাজের বাইরে প্রতিদিন সামান্য সময় তারা একাজে ব্যয় করে। আর সে কারণে গ্রামের মেয়েরা পোল্ট্রি শিল্পকে মনে করে তার একান্ত নিজস্ব একটি আয়-উপার্জনের মাধ্যম। আর এই মাধ্যমকে সে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণও করতে পারে।

দেশী মুরগি পালনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকলেও এখাত অনেক রকম গুরুতর সমস্যায় আবর্তিত। স্থানীয় বা দেশী প্রজাতির মুরগির জন্ম-হার কম হয়ে থাকে। দেশী মোরগ-মুরগিদের যে খাবার দেয়া হয় তার গুণাগুণ খুব একটা ভাল হয় না এবং খাবার পাবার ক্ষেত্রেও কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। বিভিন্ন ধরনের রোগে দেশী মুরগি দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়। আর তাই দেশী মোরগ-মুরগির মৃত্যু হার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ।

ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচির উদ্ভব

বেশ কয়েকটি কারণের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাক পোল্ট্রি শিল্পে কাজ করতে মনস্থির করে কারণ এ শিল্পের জন্য সাধারণ মানের দক্ষতা এবং পুঁজির প্রয়োজন হয়। এছাড়া মুরগির ডিম ও মাংস থেকে উৎকৃষ্টমানের পুষ্টি পাওয়া যায়। পোল্ট্রি শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা একদিকে যেমন তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি পুরো পোল্ট্রি শিল্পের উপর তারা নিজেদের মালিকানাও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এ শিল্প থেকে উৎপাদিত আর্থিক সুবিধাও গ্রামীণ নারীরা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

ব্র্যাকের পোল্ট্রি কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৭৮ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জে। এখানে ৪০০ জন গ্রামীণ নারীকে দেশী মোরগ-মুরগি পালনের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ব্র্যাক স্থাপন করে নিজস্ব ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামার। সঙ্কর মুরগি শাবক প্রজননের জন্য উন্নততর প্রজাতির মুরগি শাবক বিনিময় কার্যক্রম চালু হয়। তবে এ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ১৯৮৩ সাল থেকে চালু হয় নতুন পদ্ধতি এবং ১৯৮৩ সালের পর থেকে ব্র্যাকের এ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়। ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে থেকে নারী পোল্ট্রি কর্মীদের নির্বাচন করা হয় প্রশিক্ষণের জন্য। মুরগির মৃত্যু হার কমাতে এসব নারী কর্মীদের টিকা প্রদানসহ অন্যান্য গবাদিপশুর রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম দেয়া হয়। অন্যান্য সদস্যদের উন্নততর মুরগির বাচ্চা ও মোরগ-মুরগির জন্য বিশেষ খাবার তৈরী ও সরবরাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে আইজিভিজিডি কর্মসূচির বা (Income generation for vulnerable group development) আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের জন্য চালু হল একটি নতুন কার্যক্রম। দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশ নারী এ কার্যক্রমের আওতায় এসে মোরগ-মুরগির ব্যবসায় নিজেদের মুরগির বাচ্চা লালন-পালনকারী হিসেবে, বা পোল্ট্রি কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এ পদ্ধতির প্রয়োগে আদর্শ মুরগি পালনকারীদের উদ্ভব ঘটলো। এরা উন্নতমানের প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগি উৎপাদনে সক্ষম হল।

ব্র্যাক তার নিজস্ব সরবরাহ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে ব্র্যাক ৬টি পোল্ট্রি ফার্ম ও হ্যাচারী এবং ৩টি ফিড মিল বা মুরগির খাবার প্রস্তুতকারী শিল্প পরিচালনা করছে। এছাড়া এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আরও আধুনিক মানের মুরগি রাখার খাঁচা এবং ব্রয়লার লালনপালন পদ্ধতি।

বর্তমান চিত্র

পোল্ট্রি শিল্প বিশালতা পাওয়ায় এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েই থাকে। যেমন, আঞ্চলিক অফিসগুলোতে যথাসময়ে একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা এবং তাদের খাদ্য সামগ্রী না পৌঁছানো, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাবার ফলে রিফ্রিজ্যারেটর বারে বারে বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন ভেকসিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাছাড়া পোল্ট্রি কর্মীরা কখনও কখনও যথাযথ সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়, আবার তাদের কেউবা ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহেও সমস্যার সম্মুখীন

হয়। অবশ্য গবেষণায় এসব সমস্যা গুরুতর প্রভাব রাখছে কিনা তা প্রমাণিত হয়নি।

বাংলাদেশের মোট মুরগি পালনকারীর মাত্র প্রায় ১৭ শতাংশ ব্র্যাক সদস্য। এক্ষেত্রে উপার্জিত আয় থেকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সদস্যরা প্রথমত গুরুত্বারোপ করে ব্র্যাকের ঋণ পরিশোধের উপর এবং গৃহস্থালীর কাজকর্মে যে খরচ করতে হয় তার উপর। যেসব সদস্যের ছেলে-মেয়ে রয়েছে তারা লেখাপড়ার খাতে খরচকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আবার অন্যান্যরা খাদ্যকে প্রথম স্থান দেয় এবং কাপড়-চোপড়কে দ্বিতীয় স্থানে রাখে।

গবেষণায় দেখা যায়, সব ব্র্যাক সদস্যকে ব্র্যাকের উদ্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ থেকে নেয়া হলেও এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গরিব খানাগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে। সম্পূর্ণ এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভূমিহীনরা অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে যে কোন ধরনের মুরগি কম পছন্দ করে। এরা মুরগি লালন-পালনে আগ্রহী হলেও দেশীয় মোরগ-মুরগি প্রতিপালনেই বেশি আগ্রহী।

এ গবেষণার আওতাভুক্ত দুইটি এলাকায় আইজিভিজিডি কর্মসূচি গবেষণা চলাকালীন চালু করা হয়নি। অতি দরিদ্র শ্রেণীর উপর এই কর্মসূচির কি ধরনের প্রভাব পড়ে তা জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য এলাকা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, অতি দরিদ্ররা এ কার্যক্রমের আওতায় এসেছে ঠিকই, কিন্তু এ কার্যক্রমে তারা কতদিন থাকতে পারবে সে ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থেকেই যায়।

পোল্ট্রি কর্মসূচি নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ব্যাপক সাফল্য বয়ে এনেছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পোল্ট্রি কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি অবদান রেখেছে। মুরগির বাচ্চা ও ব্রয়লার পালনকারীদের আয় যথেষ্ট বেড়েছে। বলা চলে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা আর্থিকভাবে স্বাধীন হবার পথ খুঁজে পেয়েছেন। এসব নারীরা এখন নিজেরাই পরিবারের অনেক খরচ বহনে সক্ষম হচ্ছেন। ফলে স্বামীদের আয়ের উপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। তবে এখনও এ কর্মসূচির কিছু কিছু কাজকর্ম পুরুষদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। স্বামীর উপর

নির্ভরশীলতা থেকে যাবার কারণে বাইরের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয় তা এসব নারীদের অগ্রযাত্রাকে এখনও নানাভাবে প্রভাবিত করছে।

শেষ কথা----

দেখা গেছে যে, ব্র্যাকের পোল্ট্রি কার্যক্রম এর আওতাভুক্ত এলাকাগুলোতে জীবন ও জীবিকার মানের উপর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কারণ মোরগ-মুরগি প্রতিপালনকারী সদস্যরা এই কর্মসূচির আওতায় ঋণসুবিধাসহ দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণও পায়। মোরগ-মুরগি প্রতিপালন কার্যক্রম এভাবে খানার সদস্যদের মূলধন বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদনও বৃদ্ধি করছে।

পোল্ট্রি কর্মসূচির আওতাধীন ব্র্যাকের ১.৫ মিলিয়ন সদস্যদের মাঝে এ কার্যক্রমের সুযোগ সুবিধাগুলো সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে ব্র্যাক সদস্য নন এমন আরও ০.৫ মিলিয়ন ক্ষুদ্র উৎপাদকরা অন্যান্য সংগঠনের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ায় পুরো কার্যক্রমে একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। আর এসব সংগঠনের কার্যক্রমে ব্র্যাক এর মোরগ-মুরগি প্রতিপালন কার্যক্রমের প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়।

© ব্র্যাক

ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের অর্জিত প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপ*

সমীর রঞ্জন নাথ

- ২০০০ ও ২০০১ সময়কালে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার শিখনফল পরিমাপ করা হয়।
- সর্বমোট ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে *এডুকেশন ওয়াচ* ২০০০-এ ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করেছে। শিক্ষার্থীরা পাঁচ বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে সমন্বিতভাবে এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে ধরা হয়।

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৮-১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের পূর্বে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো। ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া এরকম ১,০০০ স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমবারের মত চার বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয় এবং এই চার বছরে তাদেরকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। বর্তমান গবেষণায় ২০০০ ও ২০০১ সালে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল পরিমাপ করা শিখনফলকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় যেমন - বুদ্ধি বৃত্তিক বা জ্ঞানমূলক

*‘Achievement of competencies of the students of BRAC non-formal primary schools’ শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন রোজী নিলুফার ইয়াসমিন।

ক্ষেত্র (Cognitive domain), মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor domain) ও আবেগিক ক্ষেত্র (Affective domain)। ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ২৯টি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত। এই গবেষণায় বাংলা ও ইংরেজিতে ৩টি করে, গণিতে ৫টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ৬টি, সাধারণ বিজ্ঞানে ৯টি, এবং ধর্মে ১টি - সর্বমোট ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে *এডুকেশন ওয়াচ ২০০০*-এ ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রে সব বিষয় মিলে মোট ৬৪টি প্রশ্ন রয়েছে।

এডুকেশন ওয়াচ ২০০০-এ গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত ব্র্যাকের ২৬টি উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ৩৫৭ জন শিক্ষার্থীর (১৭৫ জন মেয়ে ও ১৮২ জন ছেলে) পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ২০০১ সালের গবেষণায় গ্রামীণ এলাকার ৩০টি টিম অফিসের প্রতিটি হতে একটি করে স্কুল নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি স্কুল থেকে ৭ জন মেয়ে ও ৭ জন ছেলে নিয়ে মোট ৪২০ জন শিক্ষার্থীকে (২১১ জন মেয়ে, ২০৯ জন ছেলে) একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হয়। দুই ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নেয়া হয় প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত করার দুই/এক মাস আগে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সব বিষয়েই ছেলেরা মেয়েদের থেকে এগিয়ে থাকে

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে সমন্বিতভাবে অর্থাৎ ভাষাগত দক্ষতায় ২০০০ সালে কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.১টি এবং ২০০১ সালে কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪টি যোগ্যতা অর্জন করেছে। গণিতে ২০০০ সালের শিক্ষার্থীরা গড়ে ৩টি ও ২০০১ সালের শিক্ষার্থীরা গড়ে ২.৮টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ২০০০ সালের শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.২টি ও ২০০১ সালের শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.১টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। উভয় ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে গড়ে ৬.৬টি করে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। দুই ব্যাচের (পৃথকভাবে) তিন ভাগের এক ভাগেরও কম শিক্ষার্থী ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতাটি অর্জন করেছে। প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সব বিষয়েই ছেলেরা মেয়েদের থেকে এগিয়ে রয়েছে।

সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে এমন শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার হার

বিষয়	মেয়ে		ছেলে		উভয়	
	২০০০	২০০১	২০০০	২০০১	২০০০	২০০১
বাংলা	৪৫	৪৮	৫২	৫৯	৪৮	৫২
ইংরেজি	২৮	২৮	২৩	৩৪	২৬	৩০
গণিত	২২	২০	২৬	২৫	২৪	২২
পরিবেশ পরিচিতি সমাজ	২৫	২১	২৯	২৯	২৬	২৪
সাধারণ বিজ্ঞান	২২	১৯	২৪	২২	২৩	২০

উপরের ছক থেকে দেখা যায় যে, বাংলা ও ইংরেজি এই দু' টি বিষয়ের সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে এমন শিক্ষার্থীদের হার ২০০০ সালের তুলনায় ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞানে এই হার কমেছে। ইংরেজিতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে ছেলে শিক্ষার্থীরা।

বছর ও লিঙ্গভেদে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতার সবগুলো অর্জন করেছে এমন শিক্ষার্থীর হার ২০০০ সালের তুলনায় ২০০১ সালে কমে গেছে। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার এই নিম্নগতি বছরভেদে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় লিঙ্গভেদেও। প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের হার ২০০০ সালের তুলনায় ২০০১ সালে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অধিক হারে কমে গিয়েছিল।

২০০০ সালের শিক্ষার্থীরা গড়ে ১৮.১টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করলেও ২০০১ সালের শিক্ষার্থীদের গড় অর্জন ১৭.৯টি। অর্থাৎ উভয় ব্যাচই গড়ে ৬৬% প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রশ্নপত্রের ৬৪টি প্রশ্নের মধ্যে ২০০১ সালের শিক্ষার্থীরা গড়ে ৩৩.৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়, যেখানে ২০০০ সালে এই সংখ্যা ছিল গড়ে ৩৬টি।

শিখনফলের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রকে প্রধান দু' টি উপভাগে (Knowledge বা 'জ্ঞানমূলক' ও Understanding বা 'বোধগম্যতা') ভাগ করে দেখা যায়,

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রের 'বোধগম্যতা' অংশের চেয়ে 'জ্ঞানমূলক' অংশের বেশি সংখ্যক প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছে। আবার বছরান্তরে এই দুই উপভাগে ঠিক উত্তর দেয়ার শতকরা হার কমেছে। ৪৫টি 'জ্ঞানমূলক' প্রশ্নের ক্ষেত্রে ২০০১ সালে শিক্ষার্থীরা গড়ে ৫৬.২% প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পেরেছে যা ২০০০ সালে ছিল ৫৯.৬%। অন্যদিকে 'বোধগম্যতা' প্রশ্নের ক্ষেত্রে ২০০০ সালে হার ছিল ৪৬.৮% যা ২০০১ সালে কমে দাঁড়ায় ৪২.১%।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট যে, পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে বিচার করলে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে যদিও দুই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতায় তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই, বছরান্তে তারা শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজিতে ভাল ফলাফল করেছে, কিন্তু গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞানে তারা খারাপ ফলাফল করেছে।

২০০০ সালের *এডুকেশন ওয়াচ* অনুযায়ী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতাধীন শিক্ষার্থীরা অন্যান্য যে কোন (সরকারি বা বেসরকারি) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভাল ফলাফল করেছে। আবার ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে অন্যান্য উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের থেকে ভাল ফলাফল করেছে। ব্র্যাক তার স্কুলগুলোতে প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা, ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আদর্শায়িত করলে এই ফলাফল আরও ভাল ও সন্তোষজনক হবে বলে আশা করা যায়।

নির্যাস ২০০৪ আগস্ট;১৪:৩৩-৩৬ © ব্র্যাক

বাংলাদেশে সাক্ষরতা: প্রয়োজন নতুন ভাবনার*

মনজুর আহমদ, সমীর রঞ্জন নাথ ও কাজী সালেহ আহমেদ

- সমাজ সচেতন কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- এডুকেশন ওয়াচ-এর তিনটি সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
- এ গবেষণায় দেশের ৬৪টি জেলার ২৬৮টি গ্রাম বা মহল্লার ৩,৮৪০টি খানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সাক্ষরতা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন - ১১ বছর ও তার বেশি বয়সী মোট ১৩,১৪৫ জন এদের মধ্যে ৫২.২% নারী।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও মৌলিক পরিস্থিতির নিরপেক্ষ ও নিয়মিত মূল্যায়নের লক্ষ্যে সমাজ সচেতন কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এডুকেশন ওয়াচ-এর তিনটি সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের জনসাধারণের সাক্ষরতা পরিস্থিতি জানার লক্ষ্যে বর্তমান সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়।

এই গবেষণায় সাক্ষরতা দক্ষতার চারটি উপাদান ছিল। এগুলো হল - পড়ার দক্ষতা, লেখার দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা এবং এই দক্ষতাগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রতিটি উপাদানের আওতায় প্রশ্নগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেন দক্ষতাগুলো চারটি স্তরে পরিমাপ করা যায়। চারটি উপাদানের দক্ষতাকে একত্রিতভাবে যাচাই করে সামগ্রিক সাক্ষরতার দক্ষতাকে চারটি স্তরে পরিমাপ করা হয়। গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষরতার চারটি স্তর হল অ-সাক্ষর, প্রাক্-সাক্ষর,

---

*`Literacy in Bangladesh-need for a new vision' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মরহুম কাজী বিল্লাল হোসেন।

প্রারম্ভিক স্তরে সাক্ষর এবং উচ্চতর স্তরে সাক্ষর। যারা প্রারম্ভিক এবং উচ্চতর স্তরের সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করেছেন তাদেরকে সম্মিলিতভাবে সাক্ষর জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষরতা এবং এর চারটি স্তরের সংজ্ঞা নিচে দেয়া হল।

সাক্ষরতা: পরিচিত বিষয় ও প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পড়তে ও লিখতে পারার দক্ষতা ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা পালনে দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা।

অ-সাক্ষর: বর্ণ ও শব্দ পড়তে ও লিখতে না পারা, গণনা করতে না পারা এবং এ কারণে এই দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে না পারা।

প্রাক-সাক্ষর: কিছু শব্দ পড়তে ও লিখতে পারা, ন্যূনতম গণনার দক্ষতার অর্জন এবং দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলোকে খুবই সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।

প্রারম্ভিক স্তরে সাক্ষর: পরিচিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত সহজ বাক্যসমূহ পড়তে ও লিখতে পারা, পাটিগণিতের চারটি মৌলিক নিয়মে অঙ্ক কষতে পারা এবং প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত পরিবেশে এই দক্ষতা ও যোগ্যতাসমূহ সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।

উচ্চতর স্তরে সাক্ষর: বিচিত্র বিষয়াবলী সম্পর্কিত লেখা সাবলীলভাবে পড়তে পারা, এ ধরনের বিষয়াবলী সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারা, পাটিগণিতের মৌলিক চার নিয়মে দক্ষতা লাভসহ গাণিতিক কার্যকারণ বুঝতে পারা, প্রাত্যহিক জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণকল্পে সামগ্রিক সাক্ষরতা দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারা।

এ গবেষণায় দেশের ৬৪টি জেলার ২৬৮টি গ্রাম/মহল্লার ৩,৮৪০টি খানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষরতা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন **১১** বছর ও তার বেশি বয়সী মোট **১৩,১৪৫** জন - এদের ৫২.২% নারী।

এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো

১. এ গবেষণা থেকে আটটি পৃথক এলাকার (ছয়টি বিভাগ, পৌরসভা ও মহানগরী এলাকা) জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার বিভিন্ন স্তর পৃথকভাবে জানা এবং নারী-পুরুষ, বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান ও বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে সাক্ষরতার স্তরগুলো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

২. সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ১১ বছর ও তার বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪১.৪ শতাংশ। এই হার সরকারিভাবে ঘোষিত হারের চেয়ে কম। কিন্তু এডুকেশন ওয়াচ ২০০১ এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি নমুনা জরিপের ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. সমীক্ষাধীন জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি "অ-সাক্ষর" এবং শতকরা দশ ভাগ "প্রাক-সাক্ষর" - এরা সকলেই প্রারম্ভিক স্তরের সাক্ষরতা দক্ষতার নিচে অবস্থান করছেন। সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বালিকা ও নারীদের পশ্চাৎপদ অবস্থান এবং শহর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকতর পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভৌগলিক অবস্থানভেদে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়

৪. দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে মাত্র একজন উচ্চতর স্তরের সাক্ষরতা অর্জন করেছে। দেখা যায় ২০.৪ শতাংশ মানুষ এমন "স্বাবলম্বী স্তরের সাক্ষরতা" অর্জন করেছেন যা তারা নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করতে পারেন অথবা পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভে প্রয়োগ করতে পারেন।

৫. সাক্ষরতা অর্জনের প্রধান বাহন হল প্রাথমিক এবং তদূর্ধ্ব স্তরের বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা। দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে আরও দুই-এক বছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পরই মাত্র একটা গ্রহণযোগ্য মাত্রার সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

৬. বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার স্তর বাড়াতে এগুলোর সুনির্দিষ্ট অবদান খুবই সামান্য। সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনে স্কুল বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম, যেমন,

সাক্ষরতার কোর্স এবং সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদির কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পাওয়া যায়নি। প্রায় ৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা সাক্ষরতা কার্যক্রম, যেমন এনজিও পরিচালিত সাক্ষরতার ক্লাশ, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন অথবা বাড়িতে স্বচেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছেন। এদের মাত্র ৩.৫ শতাংশ প্রকৃত অর্থে সাক্ষরতার দক্ষতাগুলো অর্জন করেছেন। যারা শুধু সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ১.৩ শতাংশ।

> **বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ধরনের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা স্তর বৃদ্ধিতে এগুলোর সুনির্দিষ্ট অবদান খুব সামান্যই**

৭. সাক্ষরতা দক্ষতার দু' টি প্রধান ব্যবহার হল: ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং শিশুদের পড়াশুনায় সহায়তা করা। সাক্ষরতা দক্ষতার ব্যবহার নির্ভর করে অর্জিত দক্ষতার স্তর, বাস্তব পরিস্থিতিতে এসব দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ এবং নিজেদের উপলব্ধিতে এসব সুযোগ সম্বন্ধে ধারণার উপর।

৮. প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রারম্ভিক স্তরের এবং ৮০ শতাংশ উচ্চতর স্তরের সাক্ষর জনগোষ্ঠী মনে করেন যে, সাক্ষরতা-উত্তর অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি হিসাবে জীবিকা ও রোজগারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয় এমন শিক্ষা কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন।

৯. সমীক্ষায় দেখা যায়, আয়বৃদ্ধি ও জীবিকা সম্পর্কিত সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা কর্মসূচির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণের সাক্ষরতার যে চিত্র পাওয়া গেছে তা দেশের সাক্ষরতার অবস্থার ভিত্তিরেখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং এ সংক্রান্ত তাবৎ বিভ্রান্তি দূর করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নির্যাস ২০০৪ আগস্ট;১৪:৩৭-৪৫
© ব্র্যাক

ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক বিশেষণ*

মো. কায়সার আলী খান

- অধিকাংশ ছাত্র সদস্যদের বয়স ছিল ২০ বছরের কম, ৭৯ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র।
- ছাত্র সদস্যদের ৪১.৪ শতাংশের বাবা এবং ৩৮.২ শতাংশের মা মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছেন এবং ৩৬.৫ শতাংশের বাবার পেশা ছিল কৃষি।
- সদস্যদের ৪৪ শতাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল।
- ছাত্র সদস্যদের মধ্যে ছেলেদের ৭২.৯ শতাংশ এবং মেয়েদের ৬৮ শতাংশ নিয়মিত পাঠাগারে আসে।
- মহিলারা বই লেনদেন করেন বেশি।
- পুরুষের অনীহা, মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা ও সাংসারিক কাজের কারণে অনেক মহিলা পাঠাগারে আসতে পারেন না।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা পাঠাগারে সময় কম দেন।
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সদস্যদের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অনিয়মিত সদস্যদের নিয়মিত পাঠাগারে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা যায়।

সুশীল সমাজ গঠন, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাক্ষরতা প্রচেষ্টা জোরদারকরণ ও শিক্ষার ভিত্তি প্রসারণে গণকেন্দ্র পাঠাগারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যথোপযুক্ত তথ্য সহায়তা দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ব্র্যাক

*'Socio-economic differentials of the members of BRAC *Gonokendra Pathagar*' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. কায়সার আলী খান।

এর "অব্যাহত শিক্ষা" কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৫ সালে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণকেন্দ্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। যার লক্ষ্য ছিল পল্লী অঞ্চলে শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তাদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

ব্র্যাক চার ধরনের পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। যেমন, সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, ছোট পাঠাগার এবং ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা, তহবিলের পরিমাণ, পাঠাগারের অবস্থান ও সেবার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পাঠাগারের ধরন নির্ভর করে। সাধারণ ও মহিলা পাঠাগারের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ৩০০ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ন্যূনতম ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার টাকা) যা ছোট পাঠাগারের জন্য আরও কম হতে পারে। যে সমস্ত পাঠাগার স্কুল/কলেজ (ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য) বা অন্য কোন সাধারণ স্থানে অবস্থিত এবং যা সদস্য সংখ্যা ও রিজার্ভ ফাণ্ডের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করে সেগুলিকে সাধারণ পাঠাগার বলা হয়। যে সমস্ত পাঠাগার মেয়েদের স্কুল বা মহিলা কলেজে অবস্থিত এবং সদস্য সংখ্যা ও তহবিল সাধারণ পাঠাগারের অনুরূপ সেগুলিকে মহিলা পাঠাগার বলা হয়। আর যে সমস্ত পাঠাগার স্কুল, কলেজ অথবা সাধারণ স্থানে অবস্থিত কিন্তু সদস্য সংখ্যা ও রিজার্ভ ফান্ড সাধারণ ও মহিলা পাঠাগারের তুলনায় কম সেগুলিকে ছোট পাঠাগার বলা হয়। মোবাইল বা ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার হিসাবে সাধারণ, মহিলা ও ছোট পাঠাগারের বই রিক্সা বা ভ্যানের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যার মাধ্যমে মহিলা ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী তাদের চাহিদা অনুযায়ী বই পড়ার সুযোগ পায়।

গত ডিসেম্বর ২০০১ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক মোট ৫৭০টি পাঠাগার খুলেছিল যার মধ্যে ৪৮৬টি সাধারণ, ৫৩টি মহিলা ও ৩১টি ছিল ছোট পাঠাগার। অতি সম্প্রতি ব্র্যাক ১০টি ভ্রাম্যমাণ বা মোবাইল পাঠাগার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছে।

২০০১ সাল পর্যন্ত মোট ৫৭০টি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়

পাঠাগার কর্মসূচির উপর ইতোপূর্বে সংগঠিত গবেষণার ফলাফলে কিছু নেতিবাচক দিক লক্ষ্য করা গেলেও পাঠাগার সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণের ধারণা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। গবেষণায় দেখা যায়, জনগণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে সে ধারায় কিছুটা ভাটা পড়তে

দেখা যায়। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য পাঠাগারে নিয়মিত হাজির হয় না, বই লেনদেন করে না ও তাদের সদস্যপদও নবায়ন করে না। কিছু কিছু ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মহিলা পাঠাগারে মেয়েদের প্রাধান্য থাকলেও সাধারণ ও ছোট পাঠাগারে তাদের অংশগ্রহণ বা হাজিরা কম।

সম্প্রতি ব্র্যাক মোবাইল পাঠাগার পরীক্ষমূলকভাবে চালু করেছে

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা, কারা পাঠাগারের সেবা গ্রহণ করে ও কারা গ্রহণ করে না তা যাচাই করা। পাঠাগারের সেবা গ্রহণ না করার কারণ জানা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা কেন পাঠাগার ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে না তা অনুসন্ধান করা।

কর্মসূচির ১২টি এলাকার ৩০টি পাঠাগারের ৯০৪ জন সদস্য ও সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তাছাড়া আরও ৭৪ জন অনিয়মিত সদস্য/সদস্যাদের নিবিড় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় অধিকাংশ (৮৭.৪ শতাংশ) ছাত্র সদস্যের বয়স ছিল ২০ বছরের নিচে। অন্যদিকে ১৯ শতাংশের বেশি অছাত্র সদস্যের বয়স ছিল ৫০ বছর বা তারও বেশি। ছাত্র সদস্যদের গড় বয়স ছিল ১৪.৬ যা অছাত্র সদস্যদের বেলায় ছিল ৩৭ বছর।

সদস্যদের শিক্ষা

ছাত্র সদস্যদের শতকরা ৭৯ ভাগ মাধ্যমিক স্কুলে এবং ১৬.৮ ভাগ ছিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। অছাত্র সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই (৬৭.৮ শতাংশ) ১০ বছর বা তারও বেশি সময় স্কুলে লেখাপড়া করেছে। ছাত্র সদস্যদের স্কুলে যাবার গড় সময় ছিল ৮.৭ বছর যা অছাত্রদের বেলায় ছিল ১২.১ বছর। গবেষণার ফলাফলে আরও দেখা যায়, সকল সদস্যদের স্কুলে যাবার গড় সময় ছিল ৯.২ বছর। সদস্যের ধরনভেদে তাদের স্কুলে যাবার গড় সময়ের পার্থক্য দেখা যায়। ফলাফলে দেখা যায়, পাঠাগারের অবৈতনিক সদস্যদের (honorary member) স্কুলে যাবার গড় সময় ছিল ১৩.১ বছর, আজীবন সদস্যদের ছিল ১২.১ বছর, দাতা সদস্যদের ছিল ১১.৮ বছর, সাধারণ সদস্যদের ছিল ১০.৯ বছর এবং ছাত্র সদস্যদের ছিল ৮.৭ বছর।

বাবা-মা’র শিক্ষা

পাঠাগারের ছাত্র সদস্যদের শতকরা ৪১.১ ভাগের বাবা মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে, শতকরা ২১.৬ ভাগের বাবা ১১ বছর বা তারও বেশি এবং শতকরা ৩৭ ভাগের বাবা প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে। অন্যদিকে অছাত্র সদস্যদের শতকরা ৩৭.১ ভাগের বাবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং শতকরা ৩০.৮ ভাগের বাবা প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে। ফলাফলে আরও দেখা যায়, ছাত্র সদস্যদের শতকরা ১৭.২ ভাগের বাবা এবং অছাত্রদের ১৪.৭ ভাগের বাবা কোনদিন স্কুলে যায়নি। ছাত্র সদস্যদের বাবার লেখাপড়ার গড় ছিল ৭.৫ বছর যা অছাত্রদের বাবার ক্ষেত্রে ছিল ৭ বছর।

সদস্যদের মাতার লেখাপড়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শতকরা ৩৮.২ ভাগ ছাত্র সদস্যের মা মাধ্যমিক স্কুলে, শতকরা ৩৫.৯ ভাগ মা প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে এবং শতকরা ২১.৮ ভাগের মা কোনদিন স্কুলে যায়নি। অন্যদিকে শতকরা ৩৭.১ ভাগ অছাত্র সদস্যের মা প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে, শতকরা ২৬.৬ ভাগের মা মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে এবং ৩৫ ভাগের মা কোনদিন স্কুলে যায়নি।

সদস্যদের বাবা ও নিজের পেশা

শতকরা ৩৬.৫ ভাগ ছাত্র সদস্যের বাবার পেশা ছিল কৃষি, ২৮.১ ভাগের ব্যবসা এবং ১৪.৮ ভাগের চাকুরি। অন্যদিকে অছাত্র সদস্যদের শতকরা ৩৬.৪ ভাগের নিজের পেশা ছিল শিক্ষকতা, ১৮.৯ ভাগের চাকুরি এবং ১৪.৯ ভাগের ব্যবসা।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সদস্যদের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভাল। বিভিন্ন ধরনের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগেরও অধিক হচ্ছেন আজীবন সদস্য। এছাড়া দাতা সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল ভাল। শতকরা ৪৫.৯ ভাগ সম্মানিত সদস্য, ৪২.৯ ভাগ সাধারণ সদস্য ও ৪০.২ ভাগ ছাত্র সদস্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভাল।

পাঠাগারে হাজিরা

ছাত্র সদস্যদের মধ্যে ছেলেদের প্রায় ৭২.৯ ভাগ ও মেয়েদের প্রায় ৬৮ ভাগ নিয়মিত পাঠাগারে আসে। অন্যদিকে অছাত্র সদস্যদের শতকরা ৫৭.৬ ভাগ পুরুষ ও ৪৩.২ ভাগ মহিলা নিয়মিত পাঠাগারে আসে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, ছাত্র সদস্যদের মধ্যে যারা সপ্তাহে অন্তত একবার পাঠাগারে আসে তাদেরকে নিয়মিত, যারা মাসে ২ বার আসে তাদেরকে অনিয়মিত এবং যারা এর চাইতে কম আসে বা মোটেই আসে না তাদেরকে হাজিরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনিয়মিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অছাত্র সদস্যদের মধ্যে যারা মাসে কমপক্ষে ২ বার পাঠাগারে আসেন তাদেরকে নিয়মিত, যারা মাসে কমপক্ষে ১ বার আসেন তাদেরকে অনিয়মিত এবং যারা এর চাইতে কম বা মোটেই আসেন না তাদেরকে অত্যন্ত অনিয়মিত সদস্য বলা হয়।

ছাত্র সদস্যদের শতকরা ৭২.৯ ভাগ, চাকুরিজীবীদের প্রায় ৭৭.৮ ভাগ, বেকার ও অবসরপ্রাপ্তদের প্রায় ৬৭ ভাগ, ও ১০ বছরের কম বয়সীদের ৭৬ ভাগ নিয়মিত পাঠাগারে আসে

সদস্যদের ধরন অনুযায়ী সদস্যদের হাজিরা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছাত্র সদস্যদের ৭০.৩ ভাগ নিয়মিত পাঠাগারে আসে। অন্যান্য প্রায় সবধরনের সদস্যদের হাজিরার হার শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি।

তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যাদের বয়স ১০ বছরের কম তাদের হাজিরা অন্যান্য বয়সের সদস্য অপেক্ষা বেশি (৭৬.২ ভাগ)। যাদের বয়স ১০-১৪ বছর, তাদের হাজিরা গড়ে ৭২.৪ এবং ২০-২৪ বছর বয়সী সদস্যদের গড় হাজিরা ৬৯.২। ফলাফল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সদস্যদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পাঠাগারে হাজিরা ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

অছাত্র সদস্যদের পেশা অনুযায়ী হাজিরা বিশ্লেষণে দেখা যায়, চাকুরীজীবীদের প্রায় ৭৭.৮ ভাগ সদস্য নিয়মিত পাঠাগারে আসেন। বেকার ও অবসরপ্রাপ্তদের প্রায় ৬৭ ভাগ এবং শিক্ষক সদস্যদের প্রায় ৫৮ ভাগ নিয়মিত পাঠাগারে আসেন।

ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারে ছোট শিশুরা পড়াশুনা করছে

বই লেনদেন

সদস্যদের বই লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যদিও মহিলাদের হাজিরা পুরুষদের তুলনায় কম, তারাই পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যক বই লেনদেন করেছেন। মহিলাদের মধ্যে ছাত্র সদস্যরা গত ৬ মাসে গড়ে ৯টিরও বেশি এবং অছাত্রদের মধ্যে মহিলা সদস্যরা গড়ে ৮টি বই লেনদেন করেছে যা পুরুষ ছাত্র সদস্যের বেলায় ছিল ৭.১, অছাত্র পুরুষ সদস্যদের বেলায় ৪.১। আবার বয়স্ক সদস্য অপেক্ষা কম বয়সী সদস্যরাই বেশি বই লেনদেন করেছে।

১০ বছরের কম বয়সের সদস্যরা গত ৬ মাসে সর্বাধিক গড়ে ৯.৩টি বই লেনদেন করেছে, যা ১০-১৪ বছরের বয়সের সদস্যদের বেলায় ৮.৫, ১৫-১৯ বছরের বয়সের সদস্যদের বেলায় ৭.৯টি বই। অন্যদিকে ৪৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের সদস্যরা গড়ে ৪টিরও কম বই লেনদেন করেছেন। এখানেও লক্ষ্যণীয় যে, বয়সের সাথে বই লেনদেনের একটা যোগসূত্র আছে।

প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা গত ছয় মাসে গড়ে সর্বাধিক ১০.৬টি বই লেনদেন করেছে। তার পরেই ছিল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র সদস্যদের স্থান (৯.৭)। অন্যদিকে, অছাত্র সদস্যদের মধ্যে যারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছে তারা ৫.৬টি বই লেনদেন করেছে; এই হার ছিল যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া করেছে তাদের তুলনায় বেশি (৪.০)।

ছাত্র সদস্যদের প্রাতিষ্ঠানিক পারদর্শিতা (Academic performance) অনুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যাদের প্রাতিষ্ঠানিক পারদর্শিতা ভাল তারা তুলনামূলকভাবে বেশি বই লেনদেন করেছে।

সদস্যরা পাঠাগারে নিয়মিত না আসার কারণ

একাধিক কারণে সদস্যরা পাঠাগারে নিয়মিত আসেন না বা পাঠাগার ব্যবহার করেন না। তবে অধিকাংশ সদস্যই পাঠাগারে নিয়মিত না আসার সন্তোষজনক কোন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

বেশিরভাগ অনিয়মিত সদস্যদের সাথে আলাপকালে বুঝা যায় যে, অনেকেরই পাঠাগার ব্যবহারে তেমন আগ্রহ নেই। এদের বেশিরভাগই বিশেষ করে ছাত্র সদস্য স্ব-ইচ্ছায় পাঠাগারে ভর্তি হয়নি বরং স্কুলের শিক্ষকদের নির্দেশে ভর্তি হয়েছে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, পাঠাগারে ভর্তির ফি ও চাঁদা তাদের স্কুলে ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি এর সাথে আদায় করা হয়েছে। সংশিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা পাঠাগার স্থাপনের লক্ষ্যে এটা করেছেন বলে মত প্রকাশ করেন। কারণ এ ছাড়া তাদের পক্ষে এত বড় অংকের টাকা (ন্যূনতম ৫০,০০০ টাকা) সংস্থান করা সম্ভব ছিল না।

এ ছাড়া ছাত্র সদস্য বিশেষ করে যারা এস.এস.সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয় বা অন্যত্র চলে যায় তাদের সদস্য পদ বহাল থাকলেও তারা পাঠাগারে আসতে সময় পায় না। কিছু ছাত্র সদস্য উল্লেখ করে যে, তাদের এস.এস.সি পরীক্ষা সমাগত বিধায় বর্তমানে তারা পাঠাগারে কম আসে। তাছাড়া বেশ কিছু ছাত্র সদস্য পাঠাগার অপেক্ষা বাইরের খেলাধুলায় যেমন, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদির দিকে বেশি আগ্রহী, ফলে তারাও পাঠাগারে কম আসে।

অনেক মহিলা সদস্য বলেন ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও অনেক সময় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অনীহার কারণে পাঠাগারে আসতে পারেন না। কিছু ছাত্রী সদস্য উল্লেখ করে তাদের অভিভাবকরা বাড়ির বাইরে তাদের মেয়েদের জন্য নিরাপদ বোধ করেন না। তাছাড়া অনেক মেয়েকে প্রায় সময়েই বাড়িতে তাদের মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে হয়।

কিছু অনিয়মিত সদস্য যারা আগে নিয়মিত পাঠাগারে আসতেন তারা উল্লেখ করেন যে, পাঠাগারে তাদের চাহিদা মাফিক যে বই ছিল তা পড়া শেষ হওয়ায় পাঠাগারের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে গেছে।

লক্ষ্য করা যায়, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক, কর্মসূচি সংগঠক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কদাচিৎ অনিয়মিত সদস্যদেরকে পাঠাগারে নিয়মিত আনার উদ্যোগ নেন। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সদস্যদের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অনিয়মিত সদস্যদের নিয়মিত পাঠাগারে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা সম্ভবপর।

আরও লক্ষ্য করা যায়, ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্য পাঠাগারের পিছনে তাদের শ্রম অব্যাহত রাখেন না। বিশেষ করে ব্র্যাকের অনুদান পাওয়ার পরে তারা মনে করেন পাঠাগার তার নিজস্ব আয়ের মাধ্যমেই চলবে। তাই পাঠাগারের পিছনে তাদের আর আগের মত শ্রম দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত ও একই সাথে তাদের অনেকেই একাধিক সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকেন। ফলে তারা ইচ্ছা থাকা সত্বেও

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনীয় সময় দেন না

পাঠাগারে প্র   য়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সম্পূর্ণভাবে ব্র্যাক কর্মীর উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে, এটা বলা যায় যে, পাঠাগার সমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনো কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেহেতু পাঠাগারে সদস্যদের উপস্থিতি ও বই লেনদেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পাঠাগারকে আরও গণমুখী করতে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করা একান্ত জরুরি। এজন্য পাঠাগার ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্র ন্থাগারিক ও ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ সদস্যদের চাহিদা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর কাছে পাঠাগারের সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হবে।

নির্যাস ২০০৪ আগস্ট;১৪:৪৬-৪৯

© ব্র্যাক

মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন*

মু. গোলাম সাত্তার ও সওকত গনি

- সর্বমোট ৪৮৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।
- অস্থায়ী শ্রমিকদের কেউ কেউ ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে আসেন নি।
- শুধুমাত্র টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা যায় না। এর জন্য দরকার আরো কিছু।

ঢাকা মহানগরীর যানজট দূর করা এবং যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর মহাখালী এলাকার বিমান বন্দর সড়কে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পিত ফ্লাইওভারটি দৈর্ঘ্যে ১০১২ মিটার এবং প্রস্থে ১৮.৯ মিটার। উল্লেখ্য, এটিই বাংলাদেশে প্রথম ফ্লাইওভার। ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় বহু জমি, বাড়িঘর, গাছ, দোকান ও ব্যবসাস্থল এবং বহু লোকের রুজি রোজগারের উৎস নষ্ট হবে বলে ধারণা করা হয়। তাই সরকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় যেমন: জমি হারানো, স্থায়ী দালান-কোঠা ও অস্থায়ী বাড়িঘর হারানো, ব্যবসাকেন্দ্র হারানো এবং দোকান-হোটেল-স্টলে কর্মরত লোকদের রুজি রোজগার হারানো, ইত্যাদি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য করণীয় কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয় ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগকে। সাত মাসব্যাপী একাজটি শুরু হয় ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে।

---

*'Compensating the affected persons of Mohakhali flyover in Dhaka' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মু. গোলাম সাত্তার।

জরিপ ও পি আর এ (PRA)-র মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তার আগে প্রকল্প এলাকায় বাড়িঘর, জমি ও অন্যান্য সম্পদের মালিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সড়ক ও জনপথ এবং ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্মীগণ এ সভায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত ও কাজের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রকল্প এলাকায় বাড়িঘর জরিপ থেকে জানা যায়, ফ্লাইওভার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ৪৮৫ জন তাদের বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পদ, ব্যবসা থেকে আয় এবং চাকুরি/মজুরি হারানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীবিন্যাস ও সংখ্যা নিম্নরূপ:

ফ্লাইওভার নির্মাণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি জরিপ করা হয়

ক্ষতির ধরন	**ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (সংখ্যা)**
জমি হারানো	৩
গাছ হারানো	৪
ক্ষতিগ্রস্ত বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনা	৯৮
ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী ব্যবসার মালিক	৪৭
ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী ব্যবসার কর্মচারী	২৪২
ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী/অস্থায়ী বাণিজ্যিক স্টল:	
মালিক	৪৫
শ্রমিক	৪৬
মোট	৪৮৫

সড়ক ও জনপথ বিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণের ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করে দেয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট ৪৮৫ জন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে প্রাথমিকভাবে বিবেচিত হয়। এদের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে প্রাক্কলিত হিসাবের সব টাকা প্রদান করতে হয় নি। তার

একটা বড় কারণ, অস্থায়ী শ্রমিকদের কেউ কেউ ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে আসে নি। সম্ভবত রোজগারের সন্ধানে তারা অন্যত্র চলে যায়।

সারণীতে জমি-হারানো ব্যক্তির সংখ্যা দেখানো হয়েছে তিন জন। প্রকৃতপক্ষে এর বাইরের প্রচুর জমি ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য লেগেছে। কিন্তু ঐসব জমি ছিল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মালিকানায় যেমন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের। এসব জমির ক্ষতিপুরণ বাবদ নগদ অর্থ দেয়া হয় নি। তাই তা তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয় নি।

মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়

ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ নির্ধারণ করা হয় তার পরিমাণ প্রায় ১০.৫২ লক্ষ টাকা। আর ঐ সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্থায়ী কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯.১৪ লক্ষ টাকা। এটা

মালিকদের জন্য প্রদেয় অর্থের চাইতে অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত হার ছিল বেশি। তবে আরও একটা কারণ ছিল। স্থির করা হয়েছিল যে, আয়করের আওতাধীন ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে তাদের বার্ষিক নীট আয়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণ আয়ের জন্য আয়কর দিয়েছেন সেই আয়ের ভিত্তিতেই তাদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে। দেখা গেছে, আয়কর কমানোর জন্য কিংবা কর এড়ানোর জন্য অনেক ব্যবসায়ী তাদের প্রকৃত আয় কমিয়ে দেখিয়েছে। এর ফলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যবসায়ীরা যতটা অর্থ পেতে পারতো তা তাদের অনেকেই পায়নি।

শুধুমাত্র টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা যায় না। এ জন্য আরো কিছু দরকার

শুধুমাত্র টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা যায় না। এ জন্য আরো কিছু দরকার। যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ব্যবসার জন্য অন্যত্র প্লট বা বাণিজ্যিক এলাকায় তৈরি ঘর দেয়া হলে কিংবা ব্যবসার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হলে পুনর্বাসন সহজতর হতো। তেমনি কাজ হারানো শ্রমিক-কর্মচারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তারা অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতো। দরিদ্র মহিলা, বয়স্ক শ্রমিক ও ভেন্ডার শ্রেণীর লোকদের পুনর্বাসনের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এ প্রকল্পে তেমন কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও হিসাবে ব্র্যাক এ প্রকল্প বাস্তবায়নে যে ভূমিকা পালন করেছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই তার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছে। তারা উপলব্ধি করেছে, ব্র্যাকের কর্মীরা তাদেরকে বহুভাবে সহায়তা দিয়েছে। এর ফলে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে তাদের সুবিধা হয়েছে।

© ব্র্যাক

আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা*

মু. জাবেদ হোসেন, শাহ্ নুর মাহমুদ ও মো. যাকারিয়্যা

- প্রায় ২৭% নলকূপের পানিতে বিপদসীমার উর্ধ্বে আর্সেনিক বিদ্যমান।
- নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ এবং যশোহরের ঝিকরগাছায় টিউবওয়েলের পানিতে প্রথম পর্যায়ে আর্সেনিক যে মাত্রায় ছিল দু' বছর পরও তাতে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।
- নিরাপদ পানির বিকল্প উৎসের ব্যবস্থাপনায় এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত করা হয়।
- জনগণকে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- সরকারের আর্সেনিক সমস্যা নিরসন কার্যক্রম সফল করতে এনজিওরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ২৭% নলকূপের পানিতে বিপদসীমার উর্ধ্বে আর্সেনিকের উপস্থিতি বিদ্যমান। বাংলাদেশের ২০টি জেলায় এক জরিপ পরিচালনা করে ১৮টি জেলাতেই বিভিন্ন ধরনের আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ এবং যশোহরের ঝিকরগাছা উপজেলায় ব্র্যাক আর্সেনিক সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে একটি একশন রিসার্চ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে

---

*`Experiences gained in tackling the arsenic disaster: final report on arsenic mitigation project in Sonargaon and Jhikargacha' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মু. জাবেদ হোসেন।

অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা এখানে তুলে ধরা হল। প্রকল্পটি মোট দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ জুন ১৯৯৯ থেকে ডিসেম্বর ২০০০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তীতে জানুয়ারি ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের ফলোআপের কাজ করা হয়। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য হলো:

(১) প্রথম পর্যায়ে সবুজ চিহ্নিত সকল টিউবওয়েল এবং ১০% লাল চিহ্নিত টিউবওয়েলে আর্সেনিকের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা।

(২) নিরাপদ পানির বিকল্প উৎস নির্ধারণ, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিউনিটির লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা।

(৩) কমিউনিটির লোকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নিরাপদ পানির বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা করা।

(৪) প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসা প্রদান এবং চিকিৎসার জন্য তাদের যথাযথ স্থানে প্রেরণ।

(৫) আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

(৬) আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা।

এলাকার জনগণ এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে এমন একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা যাতে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদী হয়।

প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে সোনারগাঁ থেকে ১০,০৬২টি এবং ঝিকরগাছা থেকে ১৫,৯৯৬টি সহ মোট ২৬,০৫৮টি টিউবওয়েলের পানি পুনরায় পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়। দেখা যায় উভয় এলাকায়ই টিউবওয়েলগুলোতে প্রথম পর্যায়ে আর্সেনিক যে মাত্রায় ছিল দু' বছর পরও আর্সেনিকের উপস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

প্রকল্প এলাকায় দুইবছর পরও আর্সেনিকের উপস্থিতিতে উলেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসেনি

নিরাপদ পানির বিকল্প উৎসের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপজেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটিতে এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। যে সকল কমিটিতে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয় সেগুলো হলো: (ক) উপজেলা কমিটি (খ) ইউনিয়ন কমিটি (গ) ওয়ার্ড কমিটি ও (ঘ) গ্রাম কমিটি।

নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎসের সঠিক ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কমিটি গঠন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ৬,৪৩৪টি পরিবারের জন্য হস্তচালিত গভীর নলকূপ, কূপ/কূয়া, এ্যালকান ফিল্টার ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয় এবং পানিতে আর্সেনিক এবং কলিফর্ম নির্ধারণের জন্য নিয়মিত অবলোকন করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে সোনারগাঁও এবং ঝিকরগাছা উপজেলায় ৪০৩ জন আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ২৬২ জন রোগী চিহ্নিত হয়। রোগীদেরকে ইউনিসেফের সরবরাহকৃত কেরোসেট ট্যাবলেট এবং সেলিসাইলিক এসিড প্রদান করা হয়। ১ বছর পর প্রথম পর্যায়ের ৪০৩ জন রোগীর অবস্থা পুনঃ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩১ জন রোগী ভালো হয়ে গেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জনগণকে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করতে গ্রামসভা, গণনাটক, উঠান বৈঠক ইত্যাদি বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়।

সোনারগাঁও এবং ঝিকরগাছা উপজেলায় মোট ৬৬৫ জন আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় তার আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

- আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানির উৎস ব্যবস্থাপনায় যে সকল কমিটি গঠন করা হয়েছে তা কার্যকর করার লক্ষ্যে সদস্যদেরকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব নেই। এলাকাভিত্তিক আর্সেনিক সমস্যার ধরন অনুসারে কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।
- আর্সেনিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ তাদের নিজেদেরকেই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন করবে।
- ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি বিভিন্ন রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় সংক্রমিত থাকে বলে এ পানি সরাসরি খাওয়া বা গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। ফলে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে "সংরক্ষিত পুকুর" থাকা উচিত।

বাংলাদেশের এনজিওদের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত থাকার ফলে সরকারের আর্সেনিক নিরসন কার্যক্রম সফল করার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সরকার ও এনজিওদের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।

নির্যাস ২০০৪ আগস্ট;১৪:৫৪-৫৮ © ব্র্যাক

আর্সেনিক প্রতিরোধে গ্রামীণ জনগণের কথা*

মো. যাকারিয়্যা ও মো. কাইয়ূম

- জনগণের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পাওয়ার জন্য পানির বিভিন্ন উৎস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
- বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎসের উপর জনগণের পছন্দ ও অর্থব্যয়ের ইচ্ছা জানার জন্য এই গবেষণাটি করা হয়।
- গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ৮৭% উত্তরদাতা আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানে।

গত কয়েক দশকে সরকার, এনজিও ও দাতা সংস্থাগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে নিরাপদ পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় রকমের সফলতা অর্জিত হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের বহুদিনের অভ্যাস ছিল নদী-পুকুরের পানি ব্যবহার করা। এ পানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূষণযুক্ত। এখন ৯৫% লোক ব্যবহার করছে নলকূপের পানি। এ অভ্যাস পরিবর্তন সহজে হয়নি। এক্ষেত্রে ব্যাপক গণযোগাযোগ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছে। টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ - এর ব্যবহারে মানুষ যখন স্বস্তি বোধ করছিল ঠিক তখন ১৯৯৩ সালে প্রথম চাঁপাইনবাবগঞ্জে টিউবওয়েলের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ পাওয়া গেল। আর্সেনিক দূষণে ছেয়ে গেল সারাদেশের অধিকাংশ টিউবওয়েলের পানি। মানুষ তখন দিশেহারা। শুরু হলো আর্সেনিক সমস্যা দূর করার জন্য টেকসই সমাধান বের করার প্রচেষ্টা। আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে।

---

*`Fighting Arsenic: Listening to Rural Communities' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. কাইয়ূম।

জনসাধারণের নিকট কোন ধরনের পানির উৎস কেমন লাগছে, কি তাদের পছন্দ-অপছন্দ এ ব্যাপারে এখনো গবেষণা চলছে।

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির বিভিন্ন উৎসের জন্য জনগণের পছন্দ-অপছন্দ ও অর্থব্যয় করার ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানার উদ্দেশ্যে গবেষণাটি করা হয়। চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ, বরিশাল এবং চাঁদপুরের ২,৫০০ পরিবার এবং কন্ট্রোল (অনাক্রান্ত) এলাকার ৩০০ পরিবার এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

আর্সেনিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পরিবারের ধারণা

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৭%) আর্সেনিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানে। তারা বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা (সরকারি-বেসরকারি) যারা গ্রামে কাজ করছে তাদের কাছ থেকে এবং রেডিও-টিভির মাধ্যমে আর্সেনিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জেনেছে। তবে তাদের অনেকেই আর্সেনিক দূষণের ফলে মারাত্মক অসুখ ও স্বাস্থ্যঝুঁকির ব্যাপারে সচেতন না। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ জানে মাত্র এক-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় লম্বা সময় ধরে আক্রান্ত হলে গেংগ্রিন বা ক্যানসার এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তা অধিকাংশ উত্তরদাতার জানা নেই।

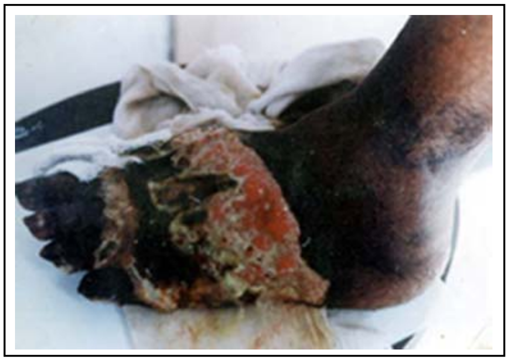

দীর্ঘ সময়ের আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় গেংগ্রিন বা ক্যানসার এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে

টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ও পানি ব্যবহার

পরীক্ষিত টিউবওয়েলের মধ্যে চাঁদপুরের ৯০%, বরিশালের ৪১% এবং নওয়াবগঞ্জের ২৩% টিউবওয়েল অধিকমাত্রায় আর্সেনিকযুক্ত। আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহার পরিহার করে ২০% পরিবার আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবহার শুরু করেছে। তবে ১৫% পরিবার আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হল যথোপযুক্ত নিরাপদ বিকল্প উৎসের অভাবে আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি ব্যবহার করছে তারা।

চাঁদপুর, বরিশাল, এবং নওয়াবগঞ্জের টিউবওয়েলগুলোতে অধিকমাত্রায় আর্সেনিক যুক্ত

আর্সেনিকমুক্ত পানি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উৎসের ব্যাপারে পরিবারের পছন্দ অপছন্দ

আর্সেনিকমুক্ত পানির ৬টি বিকল্প উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্র হ করা হয়। উৎসগুলো হল ১) তিনকলসী (পরিবারভিত্তিক), ২) অ্যাকটিভেটেড অ্যালোমিনা পদ্ধ তি (পরিবারভিত্তিক), ৩) অ্যাকটিভেটেড অ্যালোমিনা পদ্ধ তি (কমিউনিটিভিত্তিক), ৪) কুয়া (কমিউনিটিভিত্তিক), ৫) পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (কমিউনিটিভিত্তিক) এবং ৬) গভীর নলকূপ (কমিউনিটিভিত্তিক)। উত্তরদাতাদের ৭২% কমিউনিটিভিত্তিক উৎসকে অগ্র াধিকার দিয়েছে। গভীর নলকূপকে প্র থম অগ্র াধিকার দিয়েছে ৭২% উত্তরদাতা। বাদ-বাকী ৫টি পদ্ধ তির মধ্যে তিন কলসী পদ্ধ তিকে তুলনামূলকভাবে বেশি পছন্দ করেছে উত্তরদাতারা। কুয়া এবং পুকুর পাড়ের ফিল্টারের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম পছন্দ দেখা গেছে।

৫টি পদ্ধতির মধ্যে তিন কলসী পদ্ধতিকে তুলনামূলকভাবে বেশি পছন্দ করেছে উত্তরদাতারা

আর্সেনিকমুক্ত পানি পাওয়ার জন্য তিন কলসী পদ্ধতিকে তুলনামূলকভাবে বেশি পছন্দ করেছে উত্তরদাতারা

পাইপ ওয়াটার পদ্ধতির উপর মতামত

গবেষণা এলাকার প্রায় ৬০% উত্তরদাতার (পরিবার) বলেছেন, পাইপওয়াটার পদ্ধতিতে পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়। ৪৭% উত্তরদাতা মনে করেন এই পানি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং এই পদ্ধতিতে পানি পাওয়া সুবিধাজনক। কন্ট্রোল এলাকার ক্ষেত্রেও উত্তরদাতাদের অনুরূপ ধারণা পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, পরিবারের আয়-ব্যয়ের সাথে পানির চাহিদার মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। তুলনামূলক আয় উপার্জন বেশি এই ধরনের পরিবারের এ পদ্ধতিতে পানি পাওয়ার চাহিদা বেশি ছিল। কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবীদের এই পদ্ধতির প্রতি বেশি আগ্রহ দেখতে পাওয়া গেছে। যাদের মাসিক আয় ৩,৫০০ টাকার নীচে তারা স্ট্যান্ডপোস্টের (পানি নেয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবারের জন্য নির্ধারিত একটি পানির কল) ক্ষেত্রে এককালীন গড়ে ৮৩৮ টাকা, মাসে গড়ে ৪৪ টাকা এবং বাড়ি বাড়ি পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে এককালীন গড়ে ১,৪০১ টাকা, মাসে গড়ে ৬৮ টাকা খরচ করার উপর সম্মতি দিয়েছে।

কিছু বিবেচ্য বিষয়

১. সহজ এবং খরচবহনযোগ্য ফিল্টারিং ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া দরকার। বর্তমানে চালু টিউবওয়েলের পরিবর্তে বিকল্প পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যা

আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানিই শুধু নিশ্চিত করবে না পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সুবিধাও বজায় থাকবে।

২. পাইপ ওয়াটার সিস্টেমের জন্য জনগণের খুবই আগ্রহ। অধিক ঘন বসতি এবং গ্রামীণ জনগণের আয়-উপার্জন বৃদ্ধির ফলে পাইপ ওয়াটার পদ্ধতির জন্য খরচ যোগান সম্ভব। একটি নির্ধারিত স্থান থেকে এ পদ্ধতির পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ হয় বিধায় সর্বদা নিরাপদ পানি পাওয়া, সরবরাহ করা নিশ্চিত হয়।

৩. গ্রাম বাংলায় পাইপ ওয়াটার পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের উপর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন। যে সব সংস্থা এভাবে পানি দেয়ার উপর দায়িত্ব নিতে পারে তাদের সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করা দরকার। অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে এমন অনেক সংস্থা আছে যারা এই পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে পানি সরবরাহের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, জনগণের মতামত সাপেক্ষে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। জনগণের পছন্দ-অপছন্দ, খরচ বহনের সামর্থ ইত্যাদি বিবেচনা করে নিরাপদ পানির উৎস ঠিক করা দরকার। আর এ জন্য দরকার জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

 © ব্র্যাক

গ্রাম বাংলায় অপঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা কাদের বেশি?*

আবদুলাহেল হাদী

- দেশের দশটি জেলার সত্তরটি গ্রামে পরিচালিত জরিপ থেকে জানা যায়, প্রতি এক লক্ষে অপঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২৮ জন।
- অপঘাতে মৃত্যু প্রাপ্তদের অর্ধেক মারা যায় তাদের বয়স দশ বছর পূর্ণ হবার আগেই।
- অপঘাতে মৃত্যুর হার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অনেক বেশি।
- অপঘাতে মৃত্যুরোধ করা সম্ভব যদি স্বাস্থ্য ও জন নিরাপত্তা কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা যায়।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে লক্ষ্যণীয় সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও অপঘাতজনিত মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু বিশ্বব্যাপী বেড়েই চলেছে। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত না থাকায় সঠিক হিসাব করা কঠিন। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সারা বিশ্বে প্রতি বছর অপঘাতে মারা যাচ্ছে প্রায় আঠার লক্ষ মানুষ।

নানাভাবে এই জাতীয় মৃত্যুগুলি ঘটছে। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে হত্যা, সড়ক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা পানিতে ডুবে - এইগুলো হলো অপঘাতে মৃত্যুর প্রধানতম ধরন। আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ এর মাঝে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এর পরই আছে খুন ও যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা। সড়ক দুর্ঘটনা বা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সংখ্যাও খুব কম নয়।

---

*'Risk factors of violent death in rural Bangladesh, 1990-1999' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আবদুলাহেল হাদী।

অপঘাতজনিত মৃত্যুর হার সব দেশে এক রকম নয় মোটেও। তুলনামূলকভাবে এই জাতীয় মৃত্যু বেশি ঘটছে ল্যাটিন আমেরিকায়। হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে বেশি ঘটে এই অঞ্চলটিতে। অন্যদিকে চীন, জাপান এবং ভারতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। থাইল্যান্ডে অপঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয় পানিতে ডুবে মারা গিয়ে।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অনেক বেড়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে যদিও অপঘাতে মৃত্যু একটা অন্যতম সামাজিক বা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিনির্ধারকদের কাছে তা এখনো অবহেলিতই রয়ে গেছে।

অল্প বয়স্ক বালক এবং আর্থ-সামাজিকভাবে অবহেলিতদের মধ্যে অপঘাতে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি

মৃত্যুর ঝুঁকি সবার মাঝে এবং সবখানে সমান নয়। বয়স, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থান ভেদে অপঘাতে মৃত্যুর ঝুঁকিও বিভিন্ন রকম হতে পারে। নীতি নির্ধারকদের জন্য এই তথ্যগুলি অতি প্রয়োজনীয়।

বাংলাদেশের দশটি জেলার সত্তরটি গ্রামে পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, প্রতি এক লক্ষে প্রায় ২৮ জন মানুষ প্রতি বছর মারা যান অপঘাতজনিত কারণে। মৃত্যুর এই হার অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে অনেক বেশি। এদের প্রায় অর্ধেক মারা যান তাদের বয়স দশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। অপঘাতে মৃত্যুর হার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মাঝে অনেক বেশি। বাংলাদেশ নদীবহুল হওয়ায় বর্ষাকালে পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সংখ্যা অনেক (প্রতি লক্ষে নয়জন) যার অধিকাংশই শিশু। খুন হন প্রায় সম-পরিমাণ মানুষ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে। আত্মহত্যা এবং সড়ক দুর্ঘটনাও ক্রমাগত বাড়ছে। ধনীদের তুলনায় দরিদ্র এবং শিক্ষিতদের তুলনায় অশিক্ষিতদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি। জরিপে দেখা গেছে যে, অপঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি অল্প বয়স্ক বালক এবং আর্থ-সামাজিকভাবে অবহেলিত ও দরিদ্রদের। এই জাতীয় অনাকাঙ্খিত মৃত্যুরোধ করা সম্ভব যদি স্বাস্থ্য ও জন নিরাপত্তা কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা যায়।

 © ব্র্যাক

শ্বাসকষ্টের রোগ সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যসেবিকার ভূমিকা*

আবদুলাহেল হাদী

- পাঁচ বছর কার্যক্রম চালানোর পর মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকাদের ৫৭% টিকে আছে।
- শূন্যস্থান পূরণের জন্য নেয়া নতুন সেবিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।
- দুই-তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্যসেবিকা সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ে সক্ষম।
- মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে এই হার বেশি (৭২%)।
- নিয়মিত তত্ত্বাবধান সেবিকাদের কাজের মানের উপর প্রভাব ফেলে।

অধিকাংশ দরিদ্র দেশেই শিশুমৃত্যুর প্রধান রোগটি হচ্ছে শ্বাসনালীর সংক্রমণ। আশির দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদের শ্বাসনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের উপর জোর দেয়। শিশুদের মাঝে এই রোগটির লক্ষণ দেখা দিলে তা দ্রুত সনাক্তকরণ এবং সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যদিও প্রায় অর্ধেক অসুস্থ শিশুর রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় তবুও খুব কম দেশেই এই ধরনের কর্মসূচি চালু করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় চারশত শিশু মারা যায় এই রোগে। সামগ্রিকভাবে শিশুমৃত্যু যদিও হ্রাস পাচ্ছে সে অনুযায়ী শ্বাসনালীর সংক্রমণজনিত মৃত্যু খুব

*‘Management of acute respiratory infections by community health volunteers: experience of Bangladesh rural advancement committee (BRAC)’ Bulletin of the World Health Organization 2003, 81(3):183-189 শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০৩)। সার-সংক্ষেপ করেছেন আবদুলাহেল হাদী।

একটা কমেনি। এই প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক ১৯৯২ সালে দিনাজপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলার মোট দশটি উপজেলায় শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধের এক কার্যক্রম শুরু করে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল স্বাস্থ্যসেবিকা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অসুস্থ শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে, ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ দেয় এবং মারাত্মক আক্রান্ত শিশুদের প্রয়োজনবোধে স্থানীয় বা উপজেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

এই কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি হলো ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকা এবং তাদের সহায়তাদানকারী প্রশিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়কগণ। স্থানীয়ভাবে বাছাই করা এই সেবিকা দলের অধিকাংশেরই শিক্ষা ছিল প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ। নির্বাচিত সেবিকাদের রোগ-নির্ণয় এবং সেবাদান বিষয়ে তিনদিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ব্র্যাকের একদল চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকের তত্ত্বাবধানে সেবিকারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন শ্রেণীকক্ষে এবং হাতে-কলমে বাড়ি বাড়ি ঘুরে। তাছাড়া প্রতিমাসেই সেবিকারা একদিনের সতেজক (Refresher) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ব্র্যাকের প্যারামেডিকদের কাছ থেকে। মূল প্রশিক্ষণ শেষে কাজ করতে গিয়ে অবশ্য অনেক সেবিকাই ব্র্যাক ছেড়ে চলে যান। শূন্যস্থান পূরণের জন্য যে নতুন সেবিকাদের নেয়া হয় তাদেরকে তিনদিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি। নতুনদের জন্য প্রতিমাসে একদিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা তিনমাস ধরে চলে। এই কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকির দায়িত্ব পালন করেছেন প্যারামেডিকগণ।

শ্বাসনালীর সংক্রমণজনিত রোগে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ শিশু মারা যায়

দীর্ঘ পাঁচ বছর এই স্বাস্থ্য কার্যক্রম চালানোর পর মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় যে মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকাদের মাত্র ৫৭ শতাংশ টিকে আছে। প্রায় ৭৩ শতাংশ কর্মরত সেবিকাদের কাজ নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা হয়। তত্ত্বাবধানের প্রভাব সেবিকাদের কাজের মানের উপর প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্যসেবিকা সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ে সক্ষম। মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাঝে অবশ্য এই সক্ষমতার হার বেশি (প্রায় ৭২ শতাংশ)। একইভাবে নিয়মিতভাবে তত্ত্বাবধান করেছে এমন সেবিকাদের সক্ষমতার হারও

অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। শ্বাসকষ্টের সংক্রমণ সহ যে কোন রোগ নির্ণয়েই মৌলিক প্র   শিক্ষণ ও নিয়মিত তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব তাই অস্বীকার করা যায় না।

নির্যাস ২০০৪ আগস্ট;১৪:৬৪-৬৯ © ব্র্যাক

বাংলাদেশে ৯০-র দশকে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণ এবং পুষ্টি অবস্থার পরিবর্তনশীল চিত্র - একটি তথ্যনির্ভর পর্যালোচনা*

হারুন কে.এম. ইউসুফ ও শান্তনা আর হালদার

- নব্বই-র দশকে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি , দারিদ্র্য নিরসন এবং অপুষ্টি হ্রাসে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে, এক-তৃতীয়াংশ মানুষ চরম দরিদ্রতা এবং অর্ধেক মা ও শিশু অপুষ্টির শিকার।
- সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে হতে হবে দরিদ্রমুখী।
- অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অর্ধভুক্ত-অভুক্ত-অপুষ্ট রেখে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কোনটিই অর্জন করা যাবে না।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল কৃষিনির্ভর দেশে জনমানুষের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও গুণগতমান নির্ভর করে প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের উপর। যে বছর খাদ্য উৎপাদন বেশি হয়, সে বছর খাদ্য গ্রহণ বেশি হয়, আবার খাদ্য ঘাটতির বছরে বহু মানুষকে বছরের অনেকটা সময় অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হয়। খাদ্যাভাবে তারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে, বিশেষ করে শিশু ও মায়েরা। বলাবাহুল্য, দরিদ্র জনসাধারণই এই অবস্থার শিকার হয়। বর্তমান নিবন্ধে ৯০-র দশকে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণ এবং পুষ্টি অবস্থার পরিবর্তনশীল চিত্রের একটি তথ্যনির্ভর পর্যালোচনা তুলে ধরা হল।

---

*‘Trends and patterns in food consumption and nutrition of rural and urban poor in Bangladesh, 1991-2000’ শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন ড. হারুন কে. এম. ইউসুফ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, এ দেশে ৯০-র দশকে কিছু কিছু খাদ্য যেমন ডাল, তৈলবীজ এবং ফলফলাদি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার খাদ্য সামগ্রী যেমন চাল, গম, আলু, শাক-সবজি, মাছ এবং মাংসের উৎপাদন বেড়েছে। এর মধ্যে চালের উৎপাদন সর্বাধিক (২৯%)। এই সময়ে চালের উৎপাদনের হার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়, ফলে দৈনিক জনপ্রতি চালের প্রাপ্যতা ৪৩৯গ্রাম থেকে ৪৯৯গ্রামে বৃদ্ধি পায়। চাল উৎপাদনের এই বিপুল বৃদ্ধি সারা দেশে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা হ্রাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

> **নব্বই-র দশকে কিছু কিছু খাদ্য ব্যতীত অন্য সকল প্রকার খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে**

১৯৯১-২০০০ দশকে বাংলাদেশে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা সারণী-১-এ প্রদর্শিত হল:

সারণী - ১

	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)			জনপ্রতি প্রাপ্যতা (গ্রাম)		
	৯০-৯১	৯৪-৯৫	৯৯-০০	৯০-৯১	৯৪-৯৫	৯৯-০০
খাদ্যশস্য	১৮.৮৫	১৮.০৮	২৪.৯১	৪৬৪	৪৫১	৫৩৯
চাল	১৭.৮৫	১৬.৮৩	২৩.০৭	৪৩৯	৪২২	৪৯৯
গম	১.০০	১.২৫	১.৮৪	২৫	২৯	৪০
ডাল	০.৫২	০.৫৩	০.৩৮	১৩	১২	৯
প্রাণীজ খাদ্য	২.৩৯	৩.০৯	৪.১১	৫৯	৭৫	৮৮
মাছ	০.৯০	১.২০	১.৫৫	২২	২৯	৩৩
মাংস	০.৩৬	০.৪৫	০.৬৬	৯	১১	১৪
ডিম	০.০৮	০.১৩	০.২০	২	৩	৪
দুধ	১.০	১.২৪	১.৭০	২৫	৩০	৩৭
ফল	১.৪২	১.৪৩	১.৩২	৩৫	৩৩	২৮
শাকসবজি	২.২৫	২.৫৮	৪.৪১	৫৫	৬৩	৯৫
আলু	১.২৪	১.৫০	২.৯৫	৩০	৩৭	৬৪
তৈল	০.১৩	০.১৩	০.১১	৩	৩	২
চিনি ও গুড়	০.৮	০.৮৩	০.৮৭	২০	২০	১৯
মসলা	০.৪	০.২৬	০.৪৩	১০	৮	৯

গমের উৎপাদনও এই দশকে ৮৩% বৃদ্ধি পায়, ফলে দৈনিক জনপ্রতি গমের প্রাপ্যতা ২৫ গ্রাম থেকে বেড়ে ৪০ গ্রামে উন্নীত হয়। আলুর উৎপাদন ১.২৪ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২.৯৫ মিলিয়ন টন হয়, দৈনিক জনপ্রতি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় ৩০-৩৫ গ্রাম থেকে ৬০ গ্রাম। শাক-সবজির উৎপাদন ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে জনপ্রতি প্রাপ্যতা ৩১ গ্রামে উন্নীত হয়।

নব্বই-র দশকে সকল প্রকার প্রাণীজ খাদ্যের (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ) উৎপাদনও বেশ বৃদ্ধি পায়। দেশে এই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি স্বত্বেও একমাত্র চাল ছাড়া অন্য সব খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কমই থেকে গেছে। অন্যদিকে, ঐ দশকে ডাল, ফল এবং তেলের উৎপাদনও জনপ্রতি প্রাপ্যতা হ্রাস পায়।

দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে, যেমনটি আশা করা হয়েছিল, জনসাধারণের মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৯১-২০০০ দশকে জনপ্রতি খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ দৈনিক ৭২৭ গ্রাম থেকে ৮৯২ গ্রামে, মোট খাদ্যশক্তি (ক্যালরি) গ্রহণের পরিমাণ ২০২১ কিলোক্যালরি থেকে ২১১২ কিলোক্যালরি এবং প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ৪৯গ্রাম থেকে ৫৯গ্রামে বৃদ্ধি পায়। শুধু তা-ই নয়, আগে (১৯৯১ সালে) যেখানে মোট ক্যালরির ৮৩% আসতো চাল-গম (শর্করা) থেকে, ২০০০ সালে এই হার নেমে আসে ৭৭%-এ। এ থেকে বোঝা যায়, মোট ক্যালরি গ্রহণই বাড়েনি, অ-শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের পরিমাণও বেড়েছে অর্থাৎ খাদ্য আগের তুলনায় কিছুটা সুষমও (balanced) হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়

কিন্তু তারপরেও জাতীয় খাদ্য তালিকার দিকে তাকালে বিমর্ষই হতে হয়, কেননা এখনো খাদ্যে প্রায় ১৫-২০% ক্যালরি ঘাটতি রয়ে গেছে এবং মোট ক্যালরির ৭৭% আসে শর্করা সমৃদ্ধ শস্যদানা থেকে, আর মাত্র ২৩% আসে অন্যান্য সকল প্রকার খাদ্য থেকে যা মোটেই কাম্য নয়। একটা প্রকৃত সুষম খাদ্য যা শরীরকে সুস্থ রাখে, রোগ-বালাই থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে, তাতে মোট ক্যালরির ৫০-৬০% আসা উচিত শর্করা থেকে আর বাদ-বাকী ৪০-৫০% ক্যালরি

আসা উচিত অন্যান্য খাবার থেকে, কিন্তু আমাদের খাবারে তা হচ্ছে না। আমাদের খাবার একদিকে যেমন ক্যালরি ও ভিটামিন-খনিজ লবণ ঘাটতিতে দুষ্ট, অন্যদিকে তা সুষমও নয়। এই খাবার হয়ত ক্ষুধা মেটাতে পারে, কিন্তু শরীরের কোষের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। ফলে প্রাপ্ত বয়স্কদের শরীর ভেঙ্গে পড়ে, এবং ছোটদের শরীর ঠিকমত বাড়তে পারে না। এই অবস্থার অপর নাম অপুষ্টি।

উপরে যে-সব সংখ্যা-তথ্য দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আমাদের জাতীয় গড় মান। সহজেই অনুমেয়, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেলায় এই মান আরো অসুখকর। অর্থনীতিবিদদের মতে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২০০০ সালে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৯.৮%), যা ১৯৯১ সালে ছিল ৫৮.৮ ভাগ, অর্থাৎ ঐ এক দশকে দারিদ্র্যের হার যদিও কিছুটা কমেছে, তা স্বত্বেও দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই হার শহরের তুলনায় গ্রামে অনেক বেশি (১৯৯১ সালে যথাক্রমে ৪৪.৯% ও ৬১.২%, এবং ২০০০ সালে ৩৬.৬% ও ৫৩.০%)। আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করছে চরম দারিদ্র্যের মাঝে। এই হিসাবে ২০০০ সালে বাংলাদেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৬২.২ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৪১.২ মিলিয়ন হচ্ছে চরম দরিদ্র।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী এই চরম দরিদ্র মানুষের মোট খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ২০০০ সালে গ্রাম এলাকায় ৬৯৪ গ্রাম, শহর এলাকায় ৭০২ গ্রাম, যা ১৯৯০ সালে ছিল যথাক্রমে ৬৩৮ গ্রাম ও ৭১৬ গ্রাম। ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২০০০ সালে গ্রাম এলাকায় ১৭৯৩ কিলোক্যালরি, শহর এলাকায় ১৭৬৬ কিলোক্যালরি, যা ১৯৯১ সালে ছিল যথাক্রমে ১৭২১ এবং ১৮৪৭ কিলোক্যালরি। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ১৯৯০-২০০০ দশকে দেশে সার্বিকভাবে কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও এবং দেশের গড়পড়তা খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়লেও কি গ্রাম এলাকায়, কি শহর এলাকায় দরিদ্র মানুষের খাদ্যগ্রহণে এর কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি। পুরো দশকের প্রথমে তাদের খাদ্য গ্রহণ যেমন ছিল, দশকের শেষেও প্রায় তেমনই রয়ে গেছে।

১৯৯০-২০০০ দশকে গড়পড়তা খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বাড়লেও দরিদ্র মানুষের খাদ্য গ্রহণে এর কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি

১৯৯১-২০০০ দশকে বাংলাদেশে জাতীয় গড় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ সারণী-২-এ প্রদর্শিত হল:

সারণী - ২

খাদ্য	জনপ্রতি দৈনিক গড় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ (গ্রাম)		বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দৈনিক গড় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ (গ্রাম)			
			গ্রাম এলাকা		শহর এলাকা	
	১৯৯১-৯২	২০০০	১৯৯০-৯১	২০০০	১৯৯০-৯১	২০০০
খাদ্যশস্য	৪৮৭	৪৭৪	৪৪০	৪৪৮	৪৪২	৪১৫
ডাল	১৪	১৭	১২	১১	১৮	১৪
প্রাণীজ খাদ্য	৫৬	৮৮	২৮	৩৭	৪৮	৫০
মাছ	২২	৪০	১৯	২৪	৩২	২৭
মাংস	৯	১৪	২	২	৫	৭
ডিম	২	৭	১	১	১	৩
দুধ	২৩	২৭	৬	১০	১০	১৩
ফল	৩৪	৩০	৬	৭	৮	৬
শাকসবজি	৫৭	২০৬	১০০	১২০	১১৬	১২৩
আলু+মিষ্টি আলু	৪২	৪৭	৩০	৪২	৪৭	৫১
তৈল	৭	১৪	৫	৭	১০	১২
চিনি	৬	৩	১	১	৩	৩
গুড়	১১	২	-	-	-	-
আখের গুড়	২	২	-	-	-	-
মসলা ও গুড়া মসলা, আচার, চাটনি	১১	৫৪	১৬	২১	২৪	২৮
মোট জনপ্রতি খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ	৭২৭	৮৯২	৬৩৮	৬৯৪	৭১৬	৭০২
মোট (ক্যালরি) খাদ্য শক্তি গ্রহণের পরিমাণ	২০২১	২১১২	১৭২১	১৭৯৩	১৮৪৭	১৭৬৬
মোট প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ	৪৯	৫৯	৪০.৬	৪১.৪	৪৫.৭	৪২.৪

এধরনের অপর্যাপ্ত ও অসুষম খাবার খেয়ে এই সব মানুষ সহজেই নানান ধরনের অপুষ্টির শিকার হয়ে যায়। শিশু ও মায়েরা হয় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃ-অপুষ্টির হার পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ হারের একটি। বিভিন্ন জরিপে

দেখা গেছে, ২০০০ সালে বাংলাদেশে শিশু অপুষ্টির হার ছিল প্রায় ৫০ ভাগ, আর এক দশক আগে ছিল (১৯৯১ সালে) ৬০-৭০ ভাগ। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এই হার বেশি। এই দশককালে মায়েদের অপুষ্টির হারেরও কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, গ্রামাঞ্চলে এই হার ১৯৯২ সালে ৭৬% থেকে কমে ২০০০ সালে হয়েছে ৪৫%। তবে হতাশার বিষয় হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে এখনো প্রায় অর্ধেক শিশু ও অর্ধেক মা অপুষ্ট। এদেশে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ শিশু কম ওজন (<২৫০০ গ্রাম) নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। কিশোরদের তুলনায় কিশোরীরা, যারা ভবিষ্যতের মা, বেশি অপুষ্টির শিকার। তাই অপুষ্টি এখানে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রমিত হয়ে আসছে।

শুধু সাধারণ অপুষ্টিই নয়, লৌহ ঘাটতিজনিত রক্ত স্বল্পতা, ভিটামিন-এ অভাবজনিত রাতকানা ও আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই প্রকট বাংলাদেশের শিশু ও মায়েদের মধ্যে। গত ২-৩ দশকের প্রচেষ্টায় রাতকানা এবং গত এক দশকের প্রচেষ্টায় গলগণ্ড রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা গেলেও রক্তস্বল্পতা এখনো একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য পুষ্টি সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে দুই বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে এই হার আশঙ্কাজনক হারে বেশি; ৮০%-এরও বেশি শিশু রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

উপসংহারে তাই বলা যায়, ১৯৯১-২০০০ দশক বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং অপুষ্টি বিমোচনের দশক হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এতদস্বত্বেও এদেশে এখনো জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে, এক-তৃতীয়াংশ মানুষ হত-দরিদ্র, তাদের খাবার মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত ও অসুষম এবং প্রায় অর্ধেক শিশু ও মা নিদারুণ অপুষ্টির শিকার। গ্রামাঞ্চলের চিত্র খুবই ভয়াবহ, শহরের বস্তি এলাকার অবস্থা করুণ। তাই বাংলাদেশের এই সময়ের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে হতে হবে দরিদ্রমুখী, যাতে দ্রুততম সময়ে এ দেশ থেকে দারিদ্র্যের কশাঘাত দূর করা যায়। আশার কথা হচ্ছে, সরকার, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও উন্নয়ন সহযোগীরা সে কাজটিই করে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অর্ধভুক্ত-অভুক্ত-অপুষ্ট রেখে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কোনো লক্ষ্যই অর্জন করা যাবে না।

 © ব্র্যাক

উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার ক্ষেত্রে জনগণের আচরণগত পরিবর্তন: মতলবের অভিজ্ঞতা*

সৈয়দ মাসুদ আহমেদ, এ্যালেন এম এ্যাডামস, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী ও আব্বাস ভূঁইয়া

- দরিদ্রের মাঝে কোন চিকিৎসা না করার কিংবা নিজে চিকিৎসা করার প্রবণতা বেড়েছে।
- দক্ষ চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে।
- প্রতি ৫ জনে ১ জন চিকিৎসার জন্য ঔষুধের খুচরা বিক্রেতা/হাতুড়ে ডাক্তারদের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক নানা ধরনের সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে তাদের সচেতনতা, দক্ষতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তারা আরো বেশি সচেতন হয়।

চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায় ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৯ সালে জরিপকৃত পরিবারগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের আচরণে কী পরিবর্তন এসেছে এবং এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা জানার চেষ্টা করা হয় সাম্প্রতিক একটি গবেষণার মাধ্যমে। মতলব উপজেলায় ব্র্যাক ১৯৯২ সালে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু

*'Changing health-seeking behaviour in the context of development interventions: experiences from Matlab, Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মরহুম কাজী বিলক্বিস হোসেন।

করে যেখানে আইসিডিডিআর,বি গত ৪০ বছর যাবৎ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ব্র্যাক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, টিকা, পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভধারণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে আসছে। আলোচ্য সমীক্ষায় মতলব উপজেলার ১৪টি গ্রামের তিন ধরনের পরিবার থেকে স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ কেমন এসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তিন ধরনের পরিবারের মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক সদস্যভুক্ত পরিবার, সদস্য নয় এমন দরিদ্র এবং অদরিদ্র পরিবার। সমীক্ষাভুক্ত এলাকার সকল দরিদ্র পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১৯৯৫ সালে ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যে অসুস্থতার হার ছিল ১৫%। আর সদস্য নয় এমন দরিদ্র ও অদরিদ্রদের মধ্যে এ হার ছিল ১৩%।

১৯৯৫ ও ১৯৯৯ সালে ব্র্যাক সদস্য এবং সদস্য নয় এমন দরিদ্র ও অদরিদ্রদের মধ্যে অসুস্থতার হার সারণী-১-এ প্রদর্শিত হল:

সারণী-১

১৯৯৫	ব্র্যাক সদস্যভুক্তদের খানা			সদস্য নয় এমন দরিদ্রদের খানা			সদস্য নয় এমন অদরিদ্রদের খানা		
	পু:	স্ত্রী	সকল	পু:	স্ত্রী	সকল	পু:	স্ত্রী	সকল
অসুস্থতার হার %	১৩.৬	১৫.৫	১৪.৬	১৩.০	১৩.৬	১৩.৩	১১.৪	১৪.০	১২.৭
নমুনা সংখ্যা	(১৫৫০)	(১৬৯১)	(৩২৫১)	(৩৩৬৫)	(৩৫৮৪)	(৬৯৪৯)	(৩৬২৩)	(৩৮৪৬)	(৭৪৬৯)
১৯৯৯									
অসুস্থতার হার %	১৬.৯	১৭.৩	১৭.১	১৬.৬	১৭.৬	১৭.১	১৪.৮	১৫.৯	১৫.৩
নমুনা সংখ্যা	(১২১৪)	(১২৩২)	(২৪৪৬)	(৪৫১৯)	(৪৬৯৭)	(৯২১৬)	(১৪০৬)	(১৪৫৬)	(২৮৬২)

দেখা গেছে, ১৯৯৯ সালে অসুস্থতার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, দরিদ্রদের মধ্যে ১৭% এবং অ-দরিদ্রদের মধ্যে হয় ১৫%। এ বৃদ্ধি এক বছর পূর্বের বন্যা পরবর্তী বিধ্বস্ততার প্রভাব হিসাবেই ধরা যায়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অসুস্থতার হার ছিল বেশি। সমীক্ষাভুক্ত এলাকার লোকজনের মধ্যে অসুস্থতার ধরনও ছিল

প্রায় একই রকম। তাদের মধ্যে জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয় এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যথা ইত্যাদি রোগের হার প্রায় একই রকম ছিল।

ব্র্যাক সদস্য এবং সদস্য নয় এমন দরিদ্র ও অদরিদ্রদের মধ্যে অসুস্থতার বিভিন্ন ধরন নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

	অসুস্থতার হার %					
	১৯৯৫			১৯৯৯		
	ব্র্যাক সদস্য ভুক্তদের খানা	সদস্য নয় এমন দরিদ্রদের খানা	সদস্য নয় এমন অদরিদ্রদের খানা	ব্র্যাক সদস্য ভুক্তদের খানা	সদস্য নয় এমন দরিদ্রদের খানা	সদস্য নয় এমন অদরিদ্রদের খানা
জ্বর	৪৭.২	৪৬.৯	৪৭.৩	৩৩.০	২৭.৯	২৫.৫
পেটের অসুখ- ডায়রিয়া, আমাশয়	২৫.১	২১.১	২০.২	২০.৭	১৯.৬	১৬.২
শরীর ব্যথা/দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা	৮.২	১০.১	১২.৪	২১.৪	১৭.৬	২২.৪
শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ	৮.০	৫.০	৪.৯	১০.৮	১৬.০	১৫.৫
চর্মরোগ/চোখ/ কান-নাক- গলার অসুখ	৫.৫	৫.৮	৩.৩	৫.০	৮.৬	৬.৪
অন্যান্য	৬.১	১১.১	১১.৯	৯.১	১০.১	১৪.০
নমুনা সংখ্যা	(৪৭৫)	(৯২৪)	(৯৫০)	(৩৯৭)	(১৪৮৭)	(৪২০)

১৯৯৫ সালের তুলনায় ১৯৯৯ সালে তাদের মধ্যে জ্বরের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসে, কিন্তু শরীর ব্যথা ও শ্বাস সংক্রান্ত অসুস্থতার হার বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশেরই শারীরিক অসুস্থতা চার থেকে সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাছাড়াও দেখা গেছে যাদের অসুস্থতা চার দিনের বেশি স্থায়ী হয়েছে তারা দক্ষ কোন চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী।

সময়ের ব্যবধানে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ১৯৯৫ সালে অসুস্থ জনগণের এক-চতুর্থাংশেরও কম চিকিৎসার জন্য কোন চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মত করে চিকিৎসা করত। কিন্তু ১৯৯৯ সালে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫% এ উন্নীত হয়। ফলে চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা বা পরামর্শ গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। এ গবেষণায় আরো দেখা গেছে এক-পঞ্চমাংশেরও অধিক রোগী গতানুগতিক অদক্ষ চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে, যদিও ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যে এ হার কিছুটা কমেছে। ১৯৯৫ সালে স্বচিকিৎসা কিংবা বিভিন্ন ধরনের প্যারামেডিক/স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল ১৯৯৯ সালে তা প্রায় দূরীভূত হয়েছে যদিও দক্ষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ পার্থক্য রয়ে গেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পুরুষরা অসুস্থ হলে কমই স্বচিকিৎসা করে এবং প্রায়শই কোন না কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়। মহিলাদের বেলায় এর বিপরীতটাই দেখা গেছে। সমীক্ষায় আরও দেখা যায় যারা তিনদিন বা তার বেশি সময় ধরে অসুস্থতায় ভোগেন তারা যাদের অসুস্থতা তিন দিনের পূর্বেই সেরে যায় তাদের চেয়ে দ্বিগুণ হারে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় প্রভাবিত করে তাও দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। দেখা গেছে স্বচিকিৎসা বেশি করা হয় যখন রোগী হন একজন মহিলা, কিংবা যদি ঐ এলাকায় কম দামে চিকিৎসা সেবা না পাওয়া যায়, কিংবা অসুস্থ-টা হয় স্বল্প দিনের। অন্যদিকে রোগী যদি হন পুরুষ, অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কিংবা অসুখটা হয় কঠিন এবং বেশ কিছুদিনের পুরান তাহলে কোন না কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

উপসংহারে বলা যায় যে, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে দরিদ্ররা অবধারিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা অধিক হারে ব্যবহার করবে এ ধারণাটি আলোচ্য গবেষণায় সঠিক নয় বলেই দেখা গেছে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা সত্ত্বেও দক্ষ চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান ছিল।

নির্যাস ২০০৪ আগস্ট;১৪:৭৪-৭৮

© ব্র্যাক

কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবার উপযোগিতা*

মো. ইফতেখার কাসেম, ন্যান্সি এল শোয়ান, অনিতা চৌধুরী, সালেহউদ্দীন আহমেদ, বেভারলি উইনিকফ ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

- কম জন্ম ওজনের নবজাত শিশুরা নিজেদের শরীরে তাপ ধরে রাখতে পারে না, ফলে মারা যায়।
- ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতির প্রয়োগে দেখা গেছে, শিশুকে যদি মায়ের বুকের ত্বকের সাথে ২৪ ঘন্টা রাখা হয় তাহলে তার মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়।
- ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতির বাস্তবায়নে সমন্বিত পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি কর্মীদের এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে একটি বড় আকারের গবেষণা পরিকল্পনা হাতে নেয়া হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার অনেকটা কমলেও সেই অনুপাতে নবজাতকের মৃত্যুর হার কমেনি। শিশুদের কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করা বর্তমানে একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। কম জন্ম-ওজনের (low birth weight) কারণে নবজাত শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়। কম জন্ম-ওজনের নবজাত শিশুরা নিজেদের শরীরে তাপ ধরে রাখতে পারে না, ফলে মারা যায়। ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা (Kangaroo Mother Care) পদ্ধতিতে নবজাত শিশুকে যদি মায়ের বুকের ত্বকের সাথে ২৪ ঘন্টা রাখা হয় তাহলে তার মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়।

---

*'Adaptation of kangaroo mother care for community-based application' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মরহুম কাজী বিলক্লি হোসেন।

কারণ মায়ের বুকের তাপে শিশু নিজের শরীরের তাপ বজায় রাখতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গর্ভাকলীন অবস্থায় মহিলারা বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত বলে কম ওজনের সন্তান জন্মদানের হার বেশি। অর্ধেকেরও কম সংখ্যক মহিলা স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান করে। এ পরিস্থিতিতে ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা নবজাত শিশুদের মৃত্যুরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি কর্মী যারা বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় মা ও শিশুদের পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারা কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতিতে নবজাতক শিশুকে মায়ের বুকের ত্বকের সাথে ২৪ ঘন্টা রাখা হলে মৃত্যু ঝুঁকি কমে যায়

আমাদের দেশে মহিলারা শিশুদের তার বুকের ত্বকের সাথে সরাসরি লাগিয়ে রাখা, জন্মের পর দেরীতে গোসল করানো এবং নবজাত শিশুকে বুকের উপর রেখে ঘুমানোর সাথে অপরিচিত হওয়ায় কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা আমাদের

সমাজে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে তা একটি পাইলট স্টাডির মাধ্যমে যাচাই করা হয়। আলোচ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতিতে নবজাতকের সেবা দিতে পরিবারে সবাই আগ্রহী। একজন মায়ের উক্তি "আমার বাচ্চাকে আমি বুকের উপরে কেন, পারলে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতাম"। নবজাত শিশু ও প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার সিলেটে বেশি হওয়ায় এ গবেষণাটি সেখানে করা হয়। সিলেটে অধিকাংশ মহিলা সন্তানের জন্ম দেন তার বাড়িতে। সিলেটের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলোতে নবজাত শিশুদের যত্ন নেয়ার সুবিধা খুব একটা নেই।

মোট ৩৫ জন গর্ভবতী মহিলা যাদের বয়স ১৪ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে তাদেরকে এই গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ মহিলা পরিবারের প্রধান, ৫৭ শতাংশ মহিলার কমপক্ষে আরেকটি পাঁচ বছরের কম বয়সের সন্তান রয়েছে। অধিকাংশ মহিলারই সন্তানের জন্ম নিজ বাড়িতে কোন অদক্ষ সহকারির মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রায় ৩৭% শিশুর ওজন ২.৫ কেজির কম এবং ১৪% শিশুর ওজন ২ কেজির কম।

এই গবেষণায় নবজাত শিশুদের ১.৩ থেকে ১.৫ দিনের মধ্যে ওজন নেয়া হয়। দেখা যায় যে ৩৭ শতাংশ শিশুর ওজন ২.৫ কেজির কম এবং ১৪ শতাংশ শিশুর ওজন ২ কেজির কম এবং তাদের গড় ওজন ১৮০০ থেকে ৩৭০০ গ্রামের মধ্যে। এসব শিশুদের ২৬ ভাগকে মায়েরা ছোট আকৃতির বলে মনে করেছে। সব মায়েরাই সন্তান জন্মদানের পূর্বে কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি কর্মীর শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাদের অধিকাংশই একাধিকবার পুষ্টি কর্মীর সাথে যোগাযোগ করেছেন। অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক মা তাদের নবজাত সন্তানের যত্নের ব্যাপারে অন্যের কাছ থেকে নিয়মিত তথ্য পেয়েছে। সব মায়েরাই তাদের সন্তানদের বুকে ত্বকের সাথে ধরে রাখার ব্যাপারে তাদের এলাকার পুষ্টি কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন এবং ২০ শতাংশ অন্য কারো কাছ থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছেন। নবজাতকের যত্ন ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে কোন তথ্য পায়নি। তবে কেবলমাত্র ১৪ ভাগ এবং ৩ ভাগ মা নবজাতকের পরিচর্যা বা পুষ্টি বিষয়ে রেডিও বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

এই গবেষণায় দেখা যায়, তিন-চতুর্থাংশ মা তাদের বুকের ত্বকের সাথে সন্তানের ত্বক মিলিয়ে যত্ন নেয়া স্বাভাবিকভাবেই শুরু করেন। যাদের সন্তান কম ওজন

নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা আরও বেশি করে চর্চা করে। যে সকল মায়েদের সন্তান জন্মদানের পূর্বে অথবা সন্তান জন্মদানের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের যত্ন নেয়ার ধরন প্রায় একই রকম ছিল। তবে যাদেরকে সন্তান জন্মদানের পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তারা খুব দ্রুত অর্থাৎ জন্মের দুই দিনের মধ্যে ত্বকের সাথে ত্বক মিলিয়ে সন্তানের যত্ন নেয়া শুরু করে।

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মা সন্তান জন্মের প্রথম দু' দিন অধিকাংশ সময় এবং ৪৫ শতাংশ মা সন্তান জন্মের এক সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের ত্বকের সাথে সন্তানের ত্বক মিলিয়ে যত্ন নেয়। মায়েদের এক-চতুর্থাংশ (২৬%) প্রথম একমাস ত্বকের সাথে ত্বক মিলিয়ে সন্তানের যত্ন নেয়। এক শতাংশ মা মাত্র একবার ত্বকের সাথে ত্বক মিলিয়ে শিশুর যত্ন নেন এবং যত্ন নেয়ার পর সন্তানকে দ্রুত সরিয়ে ফেলেন।

সব মহিলারাই বলেন যে, তারা পানিতে ডুবিয়ে তাদের সন্তানকে গোসল করায় এবং তারপর থেকেই তারা ভেজা বা শুকনা কাপড় দিয়ে শিশুর শরীর পরিষ্কার করে। যে সকল মায়েরা তাদের শিশুদের ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা দিয়েছে তারা অন্যদের তুলনায় তাদের বাচ্চাদের গোসল দেরীতে করিয়েছেন। যে সকল মায়েরা এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেন তারা এ পদ্ধতিতে সেবা দিয়েছেন। তাদের উত্তর ছিল এরকম: রোগ হবে না, শিশুর বৃদ্ধি ভালো হবে এবং মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হবে - তাই তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। অনেকে বলেছেন, তাদের ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদিন শিশুকে ত্বকের সাথে সরাসরি লাগিয়ে সেবা দেবার, কিন্তু সাংসারিক কাজ ও সাহায্যকারীর অভাবে তারা শিশুকে আর এ পদ্ধতিতে সেবা দিতে পারে নাই।

ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতি মায়ের দুধ খাওয়াবার প্রবণতা একচেটিয়াভাবে বৃদ্ধি করতে পারলে শিশুর ডায়েরিয়া এবং এর সম্ভাব্য ব্যাপকতাও কমে আসবে

যদি কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতি মায়ের দুধ খাওয়াবার প্রবণতা একচেটিয়াভাবে বৃদ্ধি করতে পারে তবে এ পদ্ধতি ডায়েরিয়া এবং এর সম্ভাব্য ব্যাপকতাকেও হ্রাস করতে পারবে। এছাড়া ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতি শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশকে বা বাল্যকালের শারীরিক বৃদ্ধির উৎকর্ষতা বিধানে সহায়তা করতে পারে।

নবজাত শিশুর জীবন রক্ষায় কমিউনিটিভিত্তিক ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ধারণে দেশব্যাপী একটি বড় ধরনের গবেষণা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যদি এই পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় তবে ব্র্যাক তার কর্মএলাকায় ক্যাঙ্গারু মাতৃসেবা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ সম্প্রসারিত করবে।

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

ব্র্যাকের লক্ষ্য, দর্শন এবং ব্রত
সম্পাদকীয়
ব্র্যাক গবেষণা সম্মেলন ২০০৩ অনুষ্ঠিত

আর্থ-সামাজিক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের অবস্থা পর্যালোচনা
আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব
বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: ২০০১ সালের চিত্র
ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন কৌশল
ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা
শালিস এবং ব্র্যাকের পল্লীসমাজের ভূমিকা
বাংলাদেশে মহিলাদের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং পারিবারিক নির্যাতন

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মহিলাদের যৌনরোগ সম্পর্কে সচেতন করতে এনজিওদের ভূমিকা
গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, ১৯৯৯-২০০০